বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ

কিছু বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ



মোহিত রায়

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ

কিছু বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ
কিছু বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

মোহিত রায়

ক্যাম্প

Bangladesh O Paschimbanga
Kichhu Bidhibaddha Satarkikaran
A collection of essays by Mohit Ray

mohitray@hotmail.com

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
সমীরেন্দ্র রায়

প্রকাশক
বিপ্লব দাশ
ক্যাম্প, ২ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ISBN – 81-86883-79-7

মূল্য: ৮০ টাকা

শ্রী দেবজ্যোতি রায় কে
আমার শ্রদ্ধাসহ নিবেদন

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে সাম্প্রতিক কিছু লেখালিখি একসাথে এই বইয়ে রাখা হল। পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ বামপন্থী ও সেকুলার ভাবনায় ইসলামের সঙ্গে জড়িত বিতর্কিত বিষয়কে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ এ বিষয়ে অন্য মতের কথা বললেই তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে তার তথ্য, যুক্তি সবকিছুকেই নির্বাসিত করা হয়েছে। ধর্মের কারণে বিভক্ত হওয়া পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক তোলা এক মহাপাপ। সে কারণে বাংলাদেশ নিয়ে কোন সংবাদ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রকাশিতই হয় না। সমাজবিদ্যা বা ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষক-পণ্ডিতেরা সাম্প্রদায়িক হবার ভয়ে এসব ব্যাপার এড়িয়েই গবেষণা করেন। এ রোগটি অবশ্য গত কয়েক দশকে ইউরোপ আমেরিকার বিদ্যাচর্চার মহলেও মহামারীর রূপ নিয়েছে। ফলে এক বিশাল শূণ্যতায় ডুবে যাবার আগে প্রথাগত সমাজবিদ্যা বা ইতিহাসের গবেষক না হওয়া সত্বেও আমাদের মত অনেককেই লেখালেখি করতে হয়। আদৌ গবেষণার জন্য সন্দর্ভ লেখা নয়, স্রেফ অনবরত চলে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের জন্য, তসলিমা নাসরিনের অধিকারের কথা বলার জন্য, মাদ্রাসার ধর্মীয় আবহাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাকে কলুষিত করা বন্ধের জন্য, ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াণযাত্রায় কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার জন্য আমদের লিখতে হয়। সে সব লেখা প্রকাশের স্থানও অত্যন্ত সংকুচিত। একটি বাদে সবকটি লেখাই 'দেশকাল ভাবনা''-য় প্রকাশিত। এজন্য ধন্যব্যদ অধ্যাপক রতন খাসনবীশকে। ধন্যবাদ প্রকাশক ক্যাম্পের বন্ধু বিপ্লব দাসকে।

মোহিত রায়

কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ
কিছু বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

ওদের ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের বোন কমলা ভট্টাচার্য

২১শের সকাল

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২। ঢাকা। কাক ভোর, পাঁচটা বাজে, এখনো সকালের আলো ফুটতে অনেক বাকি, ফজরের নমাজের আজান শোনা গেল। হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম বাংলাদেশের ভাষা শহীদদের স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জানাতে। আজ বাংলাদেশের ভাষা শহীদ দিবস। ২০০০ সালে ইউনেস্কো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। ১৯৭২ সাল থেকে মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানগু লি বাদ দিলে এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাতীয় অনুষ্ঠান। পেশাগত কাজে ঢাকায় এসেছি, এই মহান দিনটিতে থাকতে পেরে একটা বিশেষ অনুভূতি হচ্ছিল বৈকি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারে কয়েকবার গিয়ে স্মৃতি সৌধটি দেখেছি। এই স্মৃতি সৌধটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিলটি বের করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই। যদিও বর্তমান স্মৃতি সৌধটি প্রথম নির্মিত সৌধটি নয় এবং সেই স্থানটিতেও নয়। প্রথম নির্মিত সৌধটি পাকিস্তানি প্রশাসন অচিরেই ভেঙে দেয়। সাধারণতঃ এর চত্বরটি বেশ অপরিষ্কার থাকে, তবে এই ২০১২র ২১শে ফেব্রুয়ারির কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে স্মৃতি সৌধটিকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার আদেশ দিয়েছে।

এই ২১শের কাকভোরে স্মৃতি সৌধে যাবার আবহটি একেবারেই

আলাদা। যে হোটেলে ছিলাম সেখান থেকে সাধারণ দিনে হেঁটে মিনিট পঁচিশে পৌছন যায়। কিন্তু ২০শের সন্ধে থেকেই ঐ চত্বরে নিরাপত্তার ভীষন কড়াকড়ি। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেত্রী, সেনাপ্রধানেরা সবাই আসবেন, সুতরাং তা স্বাভাবিক। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বসে একুশের বইমেলা। আগের দিন রাত আটটায় বইমেলা শেষ হবার পরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর চলে যায় নিরাপত্তা বাহিনীর তত্বাবধানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরটি আকর্ষণীয় এজন্য যে এটি কোন আলাদা প্রাচীরে ঘেরা জায়গা নয় (যেমন যাদবপুর বা জে এন ইউ) অনেকটাই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। এটি শহরেরই একটি অংশ যার মধ্যে দিয়ে গেছে কয়েকটি প্রধান পথ, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ছাত্রছাত্রীদের আবাসন, বাংলা আকাদেমী, একপাশে রমনা ময়দান (এখন সুরাবর্দী উদ্যান) - সব মিলিয়ে শহরের মধ্যে এক আরেক শহরতলী যার মেজাজটা আলাদা। বাকি রক্ষণশীল শহরের মাঝখানে এখানে কিছুটা ফুরফুরে হাওয়া বয়, ছেলেমেয়েরা বেশ নিজেদের মত করে ঘোরাফেরা করে। গত তিন বছরের হাসিনা শাসনে এই মুক্ত হাওয়া বেশ বোঝা যায়, বোরখা এখানে প্রায় নেই আবার কলকাতা বা বর্ধমানের মতন জীনস বা স্কার্ট পরা ছাত্রীও দেখা যাবে না। যে কথা হচ্ছিল, নিরাপত্তার কারণে ও ভীড় সামলাতে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের স্মৃতি সৌধে পৌছানর পথটি পাল্টে দেওয়া হয়, পথ হয় দ্বিগুণ।

মাঝরাতেই যাব ভেবেছিলাম কিন্তু হোটেলের প্রহরীরা বললেন এত রাতে পথঘাট নিরাপদ নয়, ফজরের আজান হলে বেরোনই ভাল। ঢাকা শহর একেবারে যে নিরাপদ নয় তা শহরের অটোরিক্স-র লোহার জালে ঢাকা চেহারা দেখলে বোঝা যায়। এরকম ভারতের কোন শহরে দেখি নি। ফেব্রুয়ারির সকালের অল্প ঠান্ডা। রাস্তা একেবারে শুনসান, দু একটা সাইকেল, হেঁটে চলেছি কাজী নজরুল

ইসলাম এভেনিউ দিয়ে। নজরুলের সমাধি রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, এই পথের পাশেই। যখনই সেখানে গিয়েছি তখনই মনে হয়েছে নজরুল তো ভারতীয় নাগরিক, তার দেহ কেন এখানে সমাহিত। মনে হয়েছে এটা শুধু নজরুল নয় আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতারও সমাধিস্থল। নজরুলকে অতিথি হিসাবে সম্মানের জন্য বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেখানে কয়েক বছর থাকার পর ১৯৭৬-এ তাঁর মৃত্যু হয়। নজরুলের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গে, তাঁর মূল কর্মস্থল কলকাতা, ১৯৪২ সাল থেকে নির্বাক স্মৃতিভ্রষ্ট নজরুল কলকাতায়ই থেকেছেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় তাঁকে ও তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী প্রমীলা দেবীকে চিকিৎসার জন্য লন্ডন ভিয়েনায় পাঠানো হয়েছিল। সেই কবির সমাধিস্থল ঢাকা। কারণ কি তিনি মুসলমান ? ১৯৭৬-এ তাঁর মৃত্যুর সময় বাংলাদেশে সেনানায়ক জিয়ার রাজত্ব শুরু যিনি মুজিবর রহমানের হত্যার পর বাংলাদেশে আবার ইসলামি জমানা ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন, ফলে জিয়ার কি প্রয়োজন ছিল এক বাঙালি মুসলমান আইকন। আর ইসলামি মৌলবাদের পদপ্রান্তে চিরকাল নতজানু বাঙালি উদারপন্থী বুদ্ধিজীবিদল নীরব রইলেন এক বাঙালি কবির শবদেহর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায়। এখনো অবশ্য নজরুলের দেহাবশেষ ঢাকা থেকে কলকাতায় এনে সমাহিত করে এই অন্যায়ের অবসান ঘটানো যায় ।

কাজী নজরুল ইসলাম এভেনিউ ধরে শাহবাগের মোড়ে এসে পৌঁছতে লাগলো দশ মিনিট। এই মোড়ে অবশ্য তখনই বেশ কিছু মানুষজন এসে গেছেন। গতকাল রাতে একুশে বইমেলা ফেরত এই মোড় দিয়ে আসার সময় দেখেছিলাম ফুলের দোকানের সার আর তাতে তৈরি হচ্ছে বড় বড় গোলাকার ফুলে ঢাকা চাকতি - থার্মোকলের গোল চাকতিতে আঠা দিয়ে ফুল সেঁটে সুন্দর উপহার।

এই বড় বড় ফুলের চাকতি নিয়ে ভোর রাত থেকে দলে দলে মানুষ যাবেন স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জানাতে। আর অনেক ছোট বড় পুষ্প স্তবক। এবার আমি একটি পুষ্প স্তবক কিনলাম। আর কিনলাম কপালে বাঁধার 'অমর একুশে' লেখা সবুজ কাপড়ের ফিতে। আর কয়েকটা কিনে নিলাম কলকাতার বন্ধুদের জন্য। এবার কপালে ফেট্টি বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষীদের নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে অনেকটা পাক দেওয়া পথে হাঁটা শুরু করলাম। ছোট ছোট দলে, অনেকে একাই এখন পাশে হাঁটছেন, সকাল হচ্ছে। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে দেওয়ালে ঝোলানো একটি বড় ব্যানার - 'হে মহান একুশে তোমায় শ্রদ্ধাঞ্জলী। মাতৃভাষার অধিকার পেয়েছে কি আদিবাসী? - পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ।' স্মৃতি সৌধের কাছাকাছি পৌছে গেছি, এখন একের পর এক মিছিল আসছে বিভিন্ন সংগঠনের, সামনে তাদের ব্যানার, হাতে ফুলের চাকতি, স্তবক। যেহেতু এটি একটি শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান তাই পোষাকে সাদা ও কালো রঙের প্রাধান্য বেশী। স্মৃতি সৌধের ছবি অনেকেই দেখেছেন তার বর্ণনায় যাব না। অন্যান্য দিন সিঁড়ি বেয়ে একেবারে মূল বেদীতে পাঁচটি সৌধের পাশে গিয়ে দাঁড়ান যায়, আজকে তা শুধু নির্ধারিত বিশেষ অতিথিদের জন্য। রাত বারোটা এক-এ রাষ্ট্রপতি, তারপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্যরা সেখানে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। সাধারণের জন্য আজ বেদীর নীচে ফুল দেবার ব্যবস্থা। তখনও সকাল ছ'টা হয় নি, সূর্য সবে উঠছে, তখনই জমছে ফুলের পাহাড়। আজ চত্বরে জুতো পরে ঢোকা বারণ, তাই সঙ্গের ব্যাগে পুরে নিলাম জুতো, খালি পায়ে প্রবেশ করলাম সৌধ চত্বরে। (এখানে আলাদা করে জুতো রাখার কোন ব্যবস্থা নেই, ফলে বেশিরভাগ লোকের হাতে জুতো যা একটু দৃষ্টিকটু লাগে। বরং জুতো পরে যাওয়া চালু করাই ভালো।) আমি সেখানে আমার

ক্ষুদ্র পুষ্পস্তবকটি নিয়ে দাঁড়ালাম, বিদেশের সালাম-বরকত-রফিক-জব্বরদের জানালাম আমার শ্রদ্ধা, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা - যেমন বিদেশের মাটিতে মার্কসের সমাধিতে দাঁড়িয়ে জানিয়েছি আমার শ্রদ্ধা - যেমন কোনদিন সুযোগ পেলে মস্কো'র রেড স্কয়ারে ৭ই নভেম্বর যাব রুশ বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, যাব তিয়েন আন মেন-এ।

ফিরছি আর লোক বাড়ছে শ'য়ে, শ'য়ে। কত রকমের সংগঠনের যে মানুষেরা আসছেন তাদের ব্যানার নিয়ে - আছে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষক সংগঠনেরা, আছে বাংলাদেশ ভাড়াটিয়া সংগঠন থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের সংগঠন, পথশিশুদের এনজিও, বিদেশী দূতাবাসের বিদেশী কর্মীরা - পুরো বাংলাদেশ নেমে এসেছে রাস্তায়। ফেরার পথ গেছে বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে যার বিপরীতে রমনা ময়দান, এখন নাম সুরাবর্দি উদ্যান। একাডেমির উল্টোদিকেই সুরাবর্দি উদ্যানের একটি প্রবেশপথে এবছরই প্রথম একটি অস্থায়ী তোরণ তৈরি হয়েছে যাতে লেখা শ্রী শ্রী রমনা কালিবাড়ি ও শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম। এদুটোর আসলে কোনটিই এখন নেই। তিনশ বছরের বেশী পুরানো ১২০ ফিট উঁচু শিখর বিশিষ্ট এই মন্দিরটি ছিল বহুকাল ধরে ঢাকা শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য ইমারত। অনেক দূর থেকে দেখা যেত এই প্রাচীন মন্দিরের চূড়া। রমনা ময়দানে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণের ছবির পশ্চাদপটেও দেখা যাবে রমনা কালী মন্দিরের সেই বিখ্যাত চূড়া। আর সেটাই শেষ দেখা। ১৯৭১-এ এই ধর্মীয় চত্বর ধ্বংস করে দেয় পাকিস্তানি বাহিনী। তারপর বিভিন্ন বাধায় আজ পর্যন্ত সেই বিখ্যাত মন্দির আবার নির্মাণ করা যায় নি। কয়েকটি অস্থায়ী ঘরে মন্দির করে ভাওয়ালের রাণীর কাটানো শুকনো জলাশয় নিয়ে ধীরে ধীরে অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে এই ঐতিহাসিক চত্বর। বাংলাদেশের হিন্দুদের মতনই।

হজরত শাহ্‌জালাল বিমানবন্দর ও ইছামতী নদী

এ লেখাটির কথা মাথায় আসে ২১শের সন্ধ্যায়। ভ্রমণ কাহিনি লেখার মত পর্যটক কখনো নিজেকে মনে করি নি সুতরাং ঢাকায় আগেও এসেছি, এবার নাহয় একুশে বইমেলা আর একুশের সকালে হাজির থাকতে পেরেছি - তা নিয়ে বলবার মত কিছু তালেবর আমি নই। কিন্তু একুশের সন্ধ্যায় হোটেল ঘরে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে ২১শের বিভিন্ন খবরের সাথে সাথে দেখা গেল ইছামতী নদীর দুই পাড়ে ২১শে পালনের উৎসব। দেখা গেল সীমান্ত পার হয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলার মানুষ একসাথে পালন করছেন ২১শের উৎসব, ইছামতীতে হচ্ছে নৌকার বুকে উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে ২১শে ফেব্রুয়ারি বেশ অনেক জায়গাতেই জাঁকজমক করে পালিত হয়। কলকাতার একটি সংগঠনের কথা জানি - ভাষা শহীদ স্মারক সমিতি যারা মূলতঃ একুশে পালনের জন্য কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গে কোন ভাষা শহীদ নেই সুতরাং এটি যে বাংলাদেশের ভাষা শহীদদের জন্য তা বলাই বাহুল্য। (পরে এঁরা ১৯শে মে'র কাছাড়ের বাংলা ভাষা শহীদদের কথাও বলা শুরু করলেও সেটা মনে হয় একান্তই লোক দেখানো)। এঁদের উদ্যোগে কলকাতার কেন্দ্রে সুরেন্দ্রনাথ পার্কে (কার্জন পার্ক) একটি কালো কবরের মতন শহীদ বেদী স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এহেন শহীদ বেদী আর নেই। ফলে এসব দেখেশুনে পশ্চিমবঙ্গে কিছু মানুষের ২১শের জন্য উচ্ছ্বাস ও দুই বাংলার মিলনের আদিখ্যেতার কথা ভালোই জানি। কিন্তু ঢাকায় বসে ইছামতীর বুকে ২১শে দেখে চিন্তা হল। মাস কয়েক আগে ২০১১-র বিজয়া দশমীর দিন (৬ অক্টোবর) এই ইছামতীর বুকে দুই বাংলার মানুষের বিসর্জন দেখা ও সীমান্ত পার হয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের শিথিলতার সুযোগ নিয়ে কয়েক হাজার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারি পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়ে (আনন্দবাজার - ৮ অক্টোবর,

২০১১)। ২১শে ফেব্রুয়ারির মতন একটি বিদেশী অনুষ্ঠান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে (কলকাতায় বুদ্ধিজীবিরা যত খুশী করুন) এই মাতামাতি এক অশনি সংকেত। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে কেউ ১৯শে মে-র কথা জানেন না।

বাংলাদেশ যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর দেশ নয় তা হজরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে নামলেই বোঝা যাবে। এটি ঢাকা বিমানবন্দরের সর্বশেষ নাম। এর আগে নাম ছিল জিয়া আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর, শেখ হাসিনা এবার ক্ষমতায় এসে ২০১০-এ এর নাম পরিবর্তন করেন। শেখ হাসিনা যে জিয়াউর রহমানের নামে দেশের একমাত্র প্রধান বিমানবন্দরের নাম রাখবেন না তা স্বাভাবিক কিন্তু যাতে তাঁর নতুন নামকরণ আবার পরে না পাল্টায় তাই বিমানবন্দরের নাম রাখলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক হজরত শাহজালাল-এর নামে। সুফি বলে পরিচিত হজরত শাহজালালের সমাধিস্থলটি শ্রীহট্ট ও বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ।

কে এই হজরত শাহজালাল? প্রথমেই বলা ভাল ইনি বাঙালি নন, এর জন্মস্থান ইয়েমেন (মতান্তরে তুরস্ক)। ইয়েমেনে তার জন্মস্থান বলে খ্যাত হাদরামৌত-এ (Hadhramaut) এখনো তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। এরপর বলা ভাল যে গত কয়েক দশকের বাম ও উদারপন্থী বলে পরিচিত ঐতিহাসিকদের সম্মিলিত গলাবাজীতে ইসলামের সুফি প্রচারকদের বেশ শান্তির দূত (অনেকটা ইসলামি বৈষ্ণব) বলে প্রচারিত করা গেছে। আর্যদের ভারত আগমনের মতন এই মিথ্যা অবশ্য আর্ন্তজাতিক মহলে এখন অনেকটাই অপসারিত, তবে পশ্চিমবঙ্গীয় বুদ্ধিজীবি আকাশ এখনও প্রায় সেই মিথ্যার মেঘেই ঢাকা। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ইসলাম প্রচারক ধর্মযোদ্ধার মতনই শাহজালাল ভারতে আসেন। এখানে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সুফি

সাধক বলে খ্যাত আদতে দুই ইসলামি ধর্মযোদ্ধা খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি ও নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সংস্পর্শে আসেন। শাহজালাল সুফি বলে পরিচিত হন। এসময় বাংলার কিছু অংশ মুসলমান শাসনে এসেছে। শ্রীহট্টে তখন রাজত্ব করছেন গৌর গোবিন্দ। গৌড় তখন মুসলমান পদানত, গৌড়ের সুলতান শ্রীহট্ট জয়ে দু'বার পরাজিত হয়েছেন। তার তৃতীয় আক্রমণে সহায়তার জন্য সুফি নিজামুদ্দিন আউলিয়া আরেক নয়া সুফি শাহজালালকে কয়েক'শ ধর্মযোদ্ধা দিয়ে বাংলায় পাঠান। এবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে গোবিন্দ হারলেন, এই জয়ে শাহজালালের বিভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়া সাহায্য করেছিল বলে প্রচারিত। শ্রীহট্ট জয়ের পর শুরু হল ব্যপক ধর্মান্তরকরণ। হিন্দু রাজাদের আমলের পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারগুলি এইসময় থেকে মুসলমান আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্যাপক হিন্দু ও বৌদ্ধ এই আক্রমণের মুখে ধর্মান্তরিত হন, পুর্ববঙ্গে ও আসামে ইসলামে ধর্মান্তরকরণের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত এই সুফি শাহজালাল।

এই ধর্মান্তরকরণের চ্যাম্পিয়ন বিদেশী শাহজালাল আর যাই হোক পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রিয়জন হতে পারেন না। ফলে তাঁর নামাঙ্কিত বিমানবন্দর দিয়ে প্রবেশ করা মাত্র আমি জানি যে এখানে ধর্মান্তরকরণ একটি মহান কাজ এবং তা বলপূর্বক করাতে কোন গ্লানি নেই। এখানে বোধহয় পশ্চিমবঙ্গবাসীকে পশ্চিমবঙ্গের উদ্ভবের ইতিহাসটি স্মরণ করা প্রয়োজন। ৩ জুন ১৯৪৭-এর ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলার আইন সভা 'মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ' ও 'অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ' জেলাগুলিতে বিভক্ত হয়ে দুটি আইন সভা হয়। এই 'অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ' জেলাগুলির গণতান্ত্রিক মতের ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের একমাত্র সর্ত হচ্ছে 'অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা'। শাহজালাল যে দেশের হিরো সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থান নেই। তাই সালাম-বরকত-রফিক-জব্বরদের

বাংলাদেশ আমাদের বিদেশ, সালাম-বরকত-রফিক-জব্বররা আমাদের শ্রদ্ধেয় কিন্তু আমাদের ভাই নয়।

রক্তে রাঙানো আমাদের বোনটি ও ভাইয়েরা

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষে একজন নারীসহ (কমলা ভট্টাচার্য) ১১ জন বাঙালি বাংলা ভাষার জন্য ভারতেই, আসামের শিলচরে, শহীদ হয়েছিলেন একথা আজকের পশ্চিমবঙ্গ প্রায় জানেই না। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য বা ভাষাচর্চার জগৎ ১৯শে মে সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন, এমনকি নিয়মিত বাংলা সাহিত্য-লিটল ম্যাগাজিন করেন এমন বেশীরভাগ মানুষই একবারে ১৯শে মে ব্যাপারটি কি তা বুঝেই উঠতে পারেন না। এই শহীদদের নামে কোথাও কোন স্মৃতিবেদী নেই, কোন রাস্তা কোন উদ্যান কিছুই নেই। সম্প্রতি যে ১৯শে মে-র কথা কিছু বলা শুরু হয়েছে তা খুব সম্মানজনক নয় কারণ তা বলা হচ্ছে পূর্বপাকিস্তানের ২১শে ফেব্রুয়ারির লেজুড় হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গের কোনো ঐতিহাসিক ১৯শে মের ভাষা আন্দোলন নিয়ে কোনো গবেষণা করেন নি, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ এই গবেষণায় সময় নষ্ট করেনি। একমাত্র বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছেন শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক শ্রী সুবীর কর (বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৯৯)। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন 'কিন্তু স্বাধীন ভারতে বাংলাভাষার জন্য আত্মহুতি দানের এই গৌরব আজ পশ্চিমবঙ্গে যথাযথ মর্যাদা লাভ করে না - এ কি শুধু বিস্মৃতি, উপেক্ষা, অজ্ঞতা, উন্নাসিকতা না অন্য কিছু'। করিমগঞ্জের শ্রী দিলীপকান্তি লস্কর অনেক অসুবিধার পাহাড় পেরিয়ে তাঁর সম্পাদনায় ২০০২-এ প্রকাশ করেছেন 'উনিশে মে'র ইতিহাস। তিনিও এই একই কথা জানিয়েছেন তাঁর গ্রন্থের প্রাককথনে, লিখেন '১৯-এর ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকদের কেউ এগিয়ে আসেননি, যাঁরা এসেছেন তাঁরা বিভিন্ন পেশায় সন্নিবিষ্টজন, তাঁরা সম্পূর্ণ স্বকীয়ভাবে

এই মহা সংগ্রামের বিভিন্নদিক তুলে ধরেছেন। বিস্তৃত ইতিহাস যে দুজন লিখেছেন : ডঃ সুবীর কর, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক; ডঃ কানু আইচ চিকিৎসক'। যে এগারজন বাংলা ভাষার জন্য আত্মহুতি দিলেন এঁদের মধ্যে ন'জনই পূর্বপাকিস্তান থেকে বিতাড়িত দরিদ্র উদ্বাস্তু। সুতরাং পূর্বপাকিস্তানে ও আজকের বাংলাদেশে বাংলাভাষী হলেই যে তাঁর স্বদেশে স্থান আছে তা নয়।

১৯মে'কে এই উপেক্ষা আদৌ কোন সাধারণ বিস্মৃতি নয়। পশ্চিমবঙ্গে ২১শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে উদ্দীপনা পশ্চিমবঙ্গে বিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চা ও ইসলামি অত্যাচারের ইতিহাস ও বর্তমানকে সদা সর্বদা ঢেকে রাখার প্রচেষ্টার অঙ্গ। এর মধ্যে একটি দুটি সংগঠন ও ব্যক্তি দুই বাংলার ঐক্য নিয়ে বেশ কয়েক পা এগিয়ে যেতে চান। বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি এই দুই বাংলার মিলনে খুব আগ্রহী। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়কে বাঙালির পরাজয় হিসাবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ২৩ জুন পলাশী দিবস পালন শুরু হয়েছে।

ফয়েজ আহমদ ও শামসুজ্জোহা মানিক

ফয়েজ আহমদ বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। সারা জীবন কমুনিস্ট পার্টির সঙ্গে রয়েছেন, মুক্তচিন্তা ও অসম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক কর্মীদের যে কোন সংগঠন আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন সবসময়। সাংবাদিকতার সাথে শিশু সাহিত্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান লেখক, পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার থেকে সাংবাদিকতার জন্য একুশে পদক। ৮৪ বছর বয়সে ২০শে ফেব্রুয়ারি ফয়েজ আহমদের মৃত্যু হল। ঢাকায় টিভিতে এসব নিয়ে খবর দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম যে তার শবদেহ দান করা হল বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে। পশ্চিমবঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান নামের মানুষ এখনও মরণোত্তর দেহদান করেন নি। এখন পর্যন্ত জানা চারজন মুসলমান

পদবীর ব্যক্তির দেহদান হয়েছে, তার মধ্যে গৌরী আইয়ুব সহ তিনজনই মুসলমানের সাথে বিবাহিতা হিন্দু নারী (সূত্র: গণদর্পণ)।

শামসুজ্জোহা মানিক সত্তর ছুঁয়ে এখনো টগবগে। একসময় কমুনিস্ট রাজনীতির মানুষ ছিলেন, কৃষক আন্দোলনে মাঠ পর্যায়ে ছিলেন দীর্ঘ দিন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এখন ইতিহাস ও রাজনীতির গবেষণায় রত রয়েছেন, নতুন ভাবে ইতিহাস রাজনীতির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। ওনার সম্পাদনায় www.bangarashtra.org -এ রয়েছে এক ধর্মমুক্ত সম্মিলিত বাঙালি জাতির রাষ্ট্রের 'স্বপ্ন' - হ্যাঁ, উনি নিজেই বলেছেন তা এখনো স্বপ্ন। কারণ ইসলামি মোহ থেকে বাংলাদেশের সমাজ মুক্ত না হলে তা অসম্ভব। জীবন বিপন্ন করে অসাধারণ প্রকাশনা চালাচ্ছেন, একুশে বইমেলায় দেখা হয়ে যাওয়া একটা বড় প্রাপ্তি।

আমাদের গিয়াসুদ্দিনের লড়াইটা অবশ্য আরেকটু কঠিন। কারণ তাঁকে অতিরিক্ত সামলাতে হয় পশ্চিমবঙ্গীয় মুক্তমনা 'অমুসলিম' বুদ্ধিজীবি ও মানবাধিকার নেতাদের। গিয়াসুদ্দিন লিখছেন - 'মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের প্রচারণা দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হয় অমুসলিম সমাজের মানুষজনও। তাদের মধ্যে এরূপ ধারণা পরিলক্ষিত হয় যে ইসলাম সত্যিই শান্তি, ক্ষমা ও মানবতার ধর্ম, একাংশের উগ্র ও কট্টর ধর্মীয় নেতা পর্যাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে কোরানের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা করে ইসলামকে বিপথগামী করছে ও ইসলামকে কলুষিত করছে। ..... এই বিভ্রান্তির অবসান হওয়া অত্যন্ত জরুরী। আর তার জন্যে সরাসরি কোরান-হাদিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই সবচেয়ে উত্তম।' (প্রসঙ্গঃ মুসলমান সমাজের সংস্কার, পৃঃ ২৩-২৪, অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ, কলকাতা। ২০১১)। গিয়াসুদ্দিন ঠিক জায়গাই ধরেছেন, কেউ যদি বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-মনুস্মৃতি-কথামৃতর প্রতিটি অক্ষর অভ্রান্ত মেনে, তার ন্যুনতম বিরোধিতাকে

সহিংসভাবে প্রত্যাঘাত করে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজের কথা বলেন তা একইরকম বিপজ্জনক।

২১শে ফেব্রুয়ারি দিয়ে যখন লেখার শুরু, শেষ হতে পারে আমাদের একমাত্র নারী ভাষা শহীদ কমলা-র উদ্দেশ্যে লেখা এই কবিতাটি দিয়ে -

শিলচরের কমলা ভট্টাচার্যের মায়ের কান্না

মনীশ ঘটক

সে যে বলে গেল জান দেব তবু জবান কখনো দেব না।
ভাত বেড়ে রেখো, ফিরে এসে খাবো, না এলেও মাগো ভেবো না।
যেতে দিই নাই ছোটো মঙ্গলীকে যদিও না-ছোর বান্দা
দিদি-গত প্রাণ ছিল ছুঁড়িটার তিলে তিলে দেয় প্রাণটা।

বড়ো অনটন অভাব দৈন্য ভরা এই ছোটো সংসার
মেজো বেণুবালা স্বামী কী জিনিস পায়নি সুযোগ জানবার।
অল্প বয়সে হয়েছে বিধবা শুকোয়নি আজো আঁখিজল
কমলিকে খুন করেছে স্টেশনে, দুঃসংবাদে সে পাগল।

আমরা তো কেউ জহরলালের কোনো অনিষ্ট করিনি
কল্পনাতেও অশুভ চিন্তা মনে কেউ কভু ধরিনি।
তবে কেন তিনি গৌহাটি বসে এসব কান্ড করালেন,
ঘাতক পাঠিয়ে শিলচরে কেন মরণ নিশান ওড়ালেন?

দু'চোখের মণি কমলি আমার বলেছিলো "মাগো এইবার
ম্যাট্রিক দিয়ে টাইপ শিখবো, করবো প্রচুর রোজগার।
আসবে সুদিন, দেখে নিও তুমি, দুঃখ তোমার ঘুচাব,
যতটুকু পারি দিদি মঙ্গলির চক্ষের জল মুছাব।"

ভাষা বিদ্রোহ যোগ দিতে মেয়ে চলে গেল রেল স্টেশনে,
জেদি মঙ্গলা সাথে সাথে গেল, বারণ তখন কে শোনে।
ফিরে এলো নাকো শুধু একজন, আরেক জনাও যায় যায়
ওদেরি মা আমি, মুছলাম চোখ, আমার কি সাজে হায় হায়!

যে ভাষায় মাকে প্রথম ডেকেছি সে ভাষা আমার দেবতা
কথা কইবার অধিকার তাতে - নেবোই আমরা নেবো তা,
নেহেরু-ফারুক-চালিহার চল বলে 'বুলেট, না বাংলা?'
জান দেবো তবু জবান দেবো না - করুক না যত হামলা!
৪ জুন ১৯৬১

(দেশকাল ভাবনা - ৫ জুলাই, ২০১২। শিরোনামটি কিছুটা পরিবর্তিত করা হয়েছে)

হিন্দু উদ্বাস্তুরা এখনও আসছেন

২০০০ সালে দক্ষিণ কলকাতার বেশ কয়েকটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে সর্বস্ব হারিয়ে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের কলোনির ৫০ বছর পূর্তি সাড়ম্বরে পালিত হয়। খাওয়া দাওয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বহর দেখে মনে হবে এটা এক বিজয় উৎসব, নতুন দেশের জমি গায়ের জোরে দখল করে রাজ্য স্থাপনের সুবর্ণজয়ন্তী। এঁরা যে স্রেফ হিন্দু বলে নিজেদের ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছেন, এঁদের নারীরা লাঞ্ছিতা-ধর্ষিতা হয়েছেন, এখনও বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) সেই ঘটনা ঘটে চলেছে - এরকম কোন কিছুর আভাস এইসব উৎসবে ছিল না। মূলতঃ বর্ণহিন্দু এই উদ্বাস্তুরা এতদিনে কলোনি নামটা এড়াতে পারলে খুশি হন, বেড়ার দেওয়াল আর টিনের চালের কলোনিতে এখন তিনতলা পাকা বাড়ির প্রাচুর্য। এঁরা অতীতের ভয়াবহতা ভুলেও স্মরণে আনতে চান না। ১৯৭০ পূর্বে আগত বর্ণহিন্দু উদ্বাস্তুদের অনেক বড় বড় জেলাভিত্তিক সংগঠন রয়েছে - যেমন ঢাকা সম্মিলনী, ময়মনসিংহ সম্মিলনী, চট্টগ্রাম পরিষদ ইত্যাদি। এরা কেবল পারিবারিক সুখস্মৃতিচারণ করেন, ভুলেও বর্তমান বাংলাদেশে তাদের জেলায় হিন্দুদের সাম্প্রতিক অবস্থা বা কেন তাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছিলেন তা নিয়ে মুখ খোলেন না। কেউ এসব বলতে গেলে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হন, সব ধর্মই যে সমান তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সব ধর্মই যখন সমান তখন এই বামপন্থী (মানে কংগ্রেস, কমুনিস্ট, নকশাল, তৃণমূল, মাওবাদী সবাই) ভাবধারায় দীক্ষিত এই উদ্বাস্তুকুল যে কেন ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের জমিজমা মানসম্মান নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে না থেকে

বিজয়গড়, শহীদনগরে ডোবার পাশে চালাঘর বানিয়ে থাকতে এলেন তা বোঝা দায়। এই প্রতিষ্ঠিত উদ্বাস্তু হিন্দুরা এখনও বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত হিন্দুরা উদ্বাস্তু হচ্ছে এমন খবর শুনলে আকাশ থেকে পড়েন। সম্প্রতি বামফ্রন্টের বিরোধী হাওয়ায় মারিচঝাপিতে উদ্বাস্তুদের উপর বামফ্রন্ট সরকারে ঘৃণ্য অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়েছে, কিন্তু কেউ ভুলেও বলেন না এই মানুষগুলি কেন আদৌ উদ্বাস্ত হয়েছিলেন। এই বর্ণহিন্দু উদ্বাস্তুরা এতটাই বিশ্বাসঘাতক যে তসলিমা নাসরিন 'লজ্জা' উপন্যাস লিখে সারা পৃথিবীকে (বইটি ৩৭টি ভাষায় অনুদিত) বাংলাদেশের হিন্দুদের দুরবস্থার কথা জানালেন সেই তসলিমাকে কলকাতা থেকে বিতাড়ন রুখতে এই উদ্বাস্তু পুঙ্গবদের কাউকে রাস্তায় নামতে দেখা গেল না। এরাই আবার তাদের কলোনির নাম রেখেছিলেন বিজয়গড়, প্রতাপগড়!! লেজতুলে পালানো জাতের কি রসিকতা।

একটু ইতিহাসে ফেরা যাক। ১৯৪৭ সালে অ-মুসলিমপ্রধান রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ এই দশ বছর বাংলার মুসলমান গরিষ্ঠ জোট সরকারের শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও তিরিশ বছরে একের পর এক দাঙ্গা ও নোয়াখালির বিভীষিকাময় গণহত্যা বাঙালী হিন্দুকে পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহী করে দেয়।[১] দেশভাগের সময় পাঞ্জাব ও বাংলার অবস্থার মধ্যে বড় পার্থক্য ঘটে গেল এটাই যে পাঞ্জাবের মত বাংলায় সংখ্যালঘু বিনিময় হল না। ভারতে অন্তর্ভূক্ত পূর্ব পাঞ্জাবে ১৯৪১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৩৩.০৯% যা কিনা ১৯৫১ সালে কমে ১.৮% এ দাঁড়ায়। এবং পরেও খুব একটা বাড়ে না। ফলে দেশভাগের প্রথম ক'মাস দাঙ্গা হলেও পরবর্তী ৬০ বছরে দুই পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান বা শিখ-মুসলমান দাঙ্গা হয়নি। বি আর আম্বেদকার দেশভাগের অনেক আগে ১৯৪০ সালেই সুনির্দিষ্ট

ভাবে বলেছিলেন যে "সংখ্যালঘু বিনিময়ই নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান।"[২] ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন যেখানে "দুই দেশের সংখ্যালঘুদের সমানাধিকারের ভরসা দেওয়া হয়"। এই চুক্তিতে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের "অবাধ গতিবিধি'র অধিকারের কথাও বলা হল। এই চুক্তির কারণেই তৎকালীন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পদত্যাগ করেন। ১৯৫০ সালের ১৪ই এপ্রিল সংসদে তিনি বলেন, -'ব্যাপক সংখ্যায় হিন্দুরা আসতেই থাকবেন, আর যাঁরা আসবে তাঁরা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। অন্যদিকে যে সমস্ত মুসলমান চলে গিয়েছিল তাঁরা ফিরে আসবেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস চুক্তিটির একতরফা রূপায়ণে মুসলমানেরা ভারত ছেড়ে যাবেন না। আমাদের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং আমাদের দেশের মধ্যেকার সংঘাত আরো বেড়ে যাবে।' আম্বেদকরের দৈববানীর মতো শ্যামাপ্রসাদের মন্তব্য আজও বাস্তব। মুসলমান-প্রধান পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ থেকে কমে ৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

৫০-এর দশকের উদ্বাস্তুদের বেশীর ভাগই তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু। তাঁরা জানতেন পাকিস্তানে তাঁদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, তাঁরা একেবারেই দেশত্যাগ করলেন। নিজেদের বড় বাড়িঘর জমিজমা ছেড়ে স্রেফ প্রাণ ও সম্মান বাঁচানোর জন্য শিয়ালদহ স্টেশনের রেললাইনের ধার বা বিজয়গড়ের ডোবার উপর কুঁড়েঘরে থাকা তাঁদের শ্রেয় মনে হল। নতুন দেশে ভাল ভাবে জীবন-যাপন করার মরিয়া ভাব উদ্বাস্তুদের আন্দোলনকে ধীরে ধীরে মারমুখী করে তোলে। কমুনিষ্টরা এই ক্ষোভকে ব্যবহার করে আন্দোলনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ঐতিহাসিক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর লেখায়

এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] বামপন্থী নেতারা পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামিক শাসনের বিভীষিকার বিরুদ্ধে না গিয়ে এই আন্দোলনকে নিজেদের লাইন অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ দিলেন। সেজন্য ঞ্ইছ্ই (United Central Refugee Council)-র মিছিলে স্লোগান উঠলো কোরিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদী হাত ওঠাও বা বৃটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, যে স্লোগানের সাথে উদ্বাস্তু সমস্যার কোন যোগাযোগই নেই।[৪] শুধু তাই নয় ১৯৫২ সালে ঞ্ইছ্ই-র এক কনভেনশনে যে সমস্ত প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল - ১) বিদেশী শক্তির দ্বারা শোষণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অবসান। ২) দেশীয় ভারী শিল্পে কেবল মাত্র রাশিয়ার যন্ত্রাংশই আমদানী করতে হবে।[৫]

বামপন্থী প্রভাবিত উদ্বাস্তু আন্দোলন শুধু পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের খবর চেপে গেল না, এক পা এগিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন করতে লাগলো। ১৯৫২ সালের ১৮ই অক্টোবর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে UCRC মিটিং-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে ধিক্কার জানানো হয়।[৬] ১৯৫৩ সালের ৭ এপ্রিল এক বিরাট সমাবেশ করে ঞ্ইছ্ই পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় তাদের একগুচ্ছ দাবী-দাওয়া পেশ করে। তাদের দাবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল 'বাস্তুহারা মুসলমানদের পুর্নবাসন ও তাদের জন্য অর্ন্তবর্তী ত্রাণভাতা।'[৭] কি আশ্চর্য! যাঁরা বাস্তুচ্যুত মুসলমানদের ফিরিয়ে আনতে গলা ফাটাচ্ছেন, ভুলেও তাঁরা নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের নিরাপদে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন না! নিজেদের লোকেদের প্রতি উচ্চবর্ণের উদ্বাস্তুদের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকাপাকি ভাবে বেআইনি দেশত্যাগের ধারাকে নিশ্চিত করলো। উদ্বাস্তুদের অবিরাম

দেশত্যাগ আজও চলছে। ১৯৭৫-পরবর্তী এই উদ্বাস্তুদের বেশীর ভাগই ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তপশিলী জাতি।

বাংলাদেশে কি ঘটছে

১৯৭১-এর বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল মূলতঃ লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মৃতদেহের উপর। ভাবা গিয়েছিল এবার বোধহয় সব ঠিক হয়ে যাবে কারণ পাকিস্তনিরা আর নেই। কিন্তু বাঙালি হিন্দু (উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি/বিদ্বজ্জন সহ) কোরাণ-হাদিস জানেন না যা প্রতিটি মুসলমান জানে। এই কোরাণের মূল কথা যে আল্লা ছাড়া কোন উপাস্য নেই, অন্য কোন ধর্ম নেই, বিশেষতঃ মূর্তিপূজারীরা হচ্ছে মালাউন (পোকামাকড়)। ফলে দু তিন বছরের মধ্যেই আবার হিন্দু নিপীড়ন শুরু হয়ে গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবুল বরকত এই বিষয়ে অসাধারণ গবেষণার জন্য এখন বিশ্বখ্যাত। অধ্যাপক বরকত তাঁর বইয়ে হিসাব করে বলেছেন- '১৯৬৪ থেকে ২০০১ এর মধ্যে ৮১ লক্ষ হিন্দু নিখোঁজ হয়ে গেছেন বলে ধরা যেতে পারে অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৯১৯ জন হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে যদি এই অভিবাসন শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের জন্য উদ্ভুত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণে হয়ে থাকে তবে সেজন্য ১৯৬৪ থেকে ২০০১ এ প্রতিদিন গড়ে ৬০০ জন হিন্দু নিখোঁজ হয়ে গেছেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ এ এই নিখোঁজ হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রতিদিন গড়ে ৭০৫ জন। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ তে প্রতিদিন গড়ে ৫২১ জন, ১৯৮১-১৯৯১ এ প্রতিদিন গড়ে ৪৩৮ জন এবং এই সংখ্যাটি অনেক বেড়ে ১৯৯১ থেকে ২০০১ এ দাঁড়ায় প্রতিদিন গড়ে ৭৬৭ জন।'[৮] কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষদের এসব জানার কোন উপায় নেই কারণ কোন মিডিয়া এসব খবর ছাপে না। এত

লক্ষ লক্ষ মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসাটা ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি বা পরিবেশের গবেষণার বিষয়। বাংলাদেশে তা হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা না হবার মতন। কারণ একটাই, তাহলেই পূর্ববঙ্গে ধারাবাহিক নির্যাতনের ইতিহাস প্রকাশ পেয়ে যাবে, ভেঙে যাবে সেকুলার মিথের মিথ্যা দুর্গে নিরাপত্তার মেকী আশ্রয়ে থাকা হিন্দু বাঙালির সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের দিবাস্বপ্ন। ১৯৯০ সালে বাবরি মসজিদ আক্রান্ত হওয়ার পর (সে সময় ধ্বংস হয়নি, কয়েকশো লোক তার ওপর চড়ে বসে) সারা বাংলাদেশ জুড়ে দাঙ্গা হয়। বাঙ্গালী মুসলমানেরা মন্দির ধ্বংস করেই ক্ষান্ত থাকেনি, হিন্দুদের দোকান-বাড়ী-ঘর লুট করা, এমনকি ঢাকার বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দির এবং চট্টগ্রামের কৈবল্য ধাম ভাঙচুর ও তছনছ করে।[৯] ১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ভাঙার পর যে ভয়ঙ্কর তান্ডব চলে তাতে ২৮,০০০ বাড়ি-ঘর, ৩,৬০০ মন্দির, ২,৫০০ দোকান-বাজার ধ্বংস হয়। খুন হন ১৩ জন।[১০] এর একটিও খবর হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে পৌছায় না। বাংলাদেশের আছঅই গবেষকের অধ্যয়ণে বিষয়টিকে এ ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে ‘বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার একটি প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া’।[১১]

এখন উদ্বাস্তু আন্দোলনে কি হচ্ছে

আজকের উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রধান সমস্যা হল নাগরিকত্ব। ২৯ নভেম্বর ১৯৭১, ভারত সরকারের আন্ডার সেক্রেটারি সি. এল, গোয়েল সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের একটি এক্সপ্রেস লেটার (Express Letter No ২৬০১১/১৬/৭১-১০) পাঠান। এর বিষয় : ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর যে সব উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের নাগরিকত্ব প্রদান প্রসঙ্গে। চিঠিতে বলা হয় যে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য এই সব উদ্বাস্তুদের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।[১২] ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এই

"অস্বীকৃত উদ্বাস্তু"দের সন্তানরা ভারতীয় নাগরিক হতে পারতেন। এর পর থেকে যে সব উদ্বাস্তুরা এলেন তাঁদের ছেলেমেয়েরাও বেআইনী অভিবাসী বলে চিহ্নিত হবে। এই অবস্থাকে আরো দুর্বিষহ করে তুললো ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার। ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনাবাসী ভারতীয়দের দ্বৈত নাগরিকত্বের সুবিধা দেওয়া। কিন্তু এই সংশোধনের সময় বাংলাদেশ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভয়ানক সর্বনাশ করলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর দফতর। এই সংশোধনে ভারতীয় নাগরিকত্বের সংজ্ঞায় ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর আসা বাংলাদেশী হিন্দু উদ্বাস্তুরা ও তাঁদের উত্তরপুরুষেরা সবাই পাকাপাকি বেআইনী অভিবাসী হয়ে গেলেন। এই লক্ষ লক্ষ বাঙালী উদ্বাস্তুর সর্বনাশ করা 'সাম্প্রদায়িক' এন ডি এ সরকারের আইনের প্রতিক্রিয়া কেমন হল? একমাত্র রাজ্যসভার সদস্য প্রাক্তন সেনাধিনায়ক জেনারেল শংকর রায়চৌধুরী ছাড়া পশ্চিমবাংলায় কোনও সাংসদ লোকসভায় এই আইনের প্রতিবাদ করলেন না। এই আইন পাশ হবার ৯ বছর পরেও আজ পর্যন্ত তা নিয়ে কোনও আলোচনা কোনও টিভি চ্যানেল বা পত্রপত্রিকায় নজরে পড়লো না। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই ভয়ংকর সমস্যা নিয়ে নীরব লিটল ম্যাগাজিনেরা যারা অক্লেশে প্যালেস্টাইন বা ভিয়েতনাম থেকে এইডস -সবকিছু নিয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করে ফেলে। কেন এই নীরবতা? তাহলে কি গত ৪০ বছর ধরে বাংলাদেশের ইসলামি অত্যাচারের সব খবর প্রকাশ হয়ে যাবে সেই ভয়ে? এখনকার উদ্বাস্তু আন্দোলন মূলতঃ তফশিলি উদ্বাস্তুদের আন্দোলন যে আন্দোলনের খবর চ্যাটার্জি-দাশগুপ্ত-সেন ঘরানার প্রাক ১৯৭০এর সফল উদ্বাস্তুরা খবরও রাখেন না। এই আন্দোলনের যোগাযোগ, অর্থবল, নামী লোকের অভাব। যতই ৩৪ বছর বামপন্থী

শাসন থাকুক, এ রাজ্যে গরীব মানুষের মূলতঃ তফশিলি জাতি উপজাতিদের সামজিক অগ্রগতি তেমন হয় নি। ফলে নাগরিকত্বের মত এরকম গুরুত্বপূর্ণ দাবী সাম্প্রতিক নির্বাচনে কংগ্রেস, কমুনিস্ট, তৃণমূল কারও ইস্তাহারেই ছিল না।

গত ত্রিশ বছরে যত হিন্দু উদ্বাস্তু এসেছেন তার তিনগুণ এসেছে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। আজকের নাগরিকত্ব আন্দোলনে তারাও ভিড়ে গিয়ে নাগরিকত্ব চাইছে। উদ্বাস্তু আন্দোলনের একাংশে দলিত-মুসলমান ঐক্যের আওয়াজ উঠে গেছে। এই জোটের উদ্বাস্তু আন্দোলন ২৭-২৮ নভেম্বর ২০১১-তে দিল্লিতে ধর্ণা দিয়েছিল যাতে হাজির ছিলেন অনেক মুসলমান নেতা ও ও দিল্লির বামপন্থী নেতারাও। এ ব্যাপারে অবশ্য এঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এর আগের পর্বের বর্ণহিন্দু উদ্বাস্তুরা সেকুলার লাইনে খেলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তবে এনারাই বা কেন মুসলামানদের বিরুদ্ধে বলবেন? বরং এনারা এক পা এগিয়ে মুসলমানদের বন্ধু বলে হাত ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তফশিলি আন্দোলনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নেতার অভিজ্ঞতা দেখা যাক। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ছিলেন বাংলার তফশিলী জাতিদের প্রধান নেতা, যিনি তফশিলী জাতি ও মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ও প্রচারক ছিলেন।[১৩] দেশভাগের পর তাঁকে সসম্মানে পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালের পাকিস্তানে হিন্দু (তফশীলি সহ) বিরোধী দাঙ্গার পর মুসলিম লিগের কাছের মানুষ এই মন্ত্রীমশাইকে তিন বছরের মধ্যেই কল্পিত স্বর্গরাজ্য ছেড়ে 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' হিন্দুস্থানে পালাতে হয় এবং হিন্দুস্থানে থেকেই তিনি পদত্যাগ পত্র পাঠান। যারা এখনো দলিত-মুসলিম ঐক্যের ধ্বজাধারী তাঁদের জন্য তাঁর পদত্যাগ পত্রের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। শ্রী মন্ডল লেখেন - 'সুদীর্ঘ ও উদ্বেগময় সংগ্রামের পর শেষ পর্যন্ত আমাকে একথাই বলতে হচ্ছে যে পাকিস্তান আর হিন্দুদের

বাসযোগ্য নয়। তাঁদের ভবিষ্যতে প্রাণনাশ ও ধর্মান্তরণের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে। অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু ও রাজনৈতিক সচেতন তপশিলী জাতির লোকেরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। যে সমস্ত হিন্দুরা এই অভিশপ্ত দেশে অর্থাৎ পাকিস্তানে থেকে যাবে, আমার দৃঢ বিশ্বাস ধীরে ধীরে এবং সুপরিকল্পিত ভাবে তাদের মুসলমানে পরিণত করা হবে বা নিশ্চিহ্ন করা হবে।'[১৪]

সাম্প্রতিক কালে উদ্বাস্তু মতুয়া সমাজের কথা পত্র পত্রিকায় আলোচিত হচ্ছে। তফসিলি সমাজের একটি বড় জনগোষ্ঠী এই ধর্মীয় সংঘের সঙ্গে যুক্ত। এঁদের শ্রদ্ধেয় নেতা প্রয়াত প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে (এঁনার স্ত্রী এখন বড়মা বলে পরিচিত) পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে বনগাঁর কাছে বর্তমান ঠাকুরনগরে বসবাস শুরু করেন। দেশ ছাড়ার আগে তিনি শেষ জনসভা করেন নড়াইলের জমিদারবাড়ীর প্রাঙ্গণে। সেখানে মতুয়া ভক্তবৃন্দদের বলেন - "আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মূল কান্ড থেকে কোন শাখাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সেটি অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। স্বধর্মের কোটি কোটি হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে লীগের বন্ধুত্ব অচিরেই তফসিলি জাতির বিপদ ডেকে আনবে। আপাত উন্নতির মোহে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মিঃ জিন্নাহ্‌র মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন পরিণামে অপরিসীম ক্ষতি ডেকে আনবে।" ......'কিছুদিনের মধ্যে দেশভাগ হয়ে যাবে। দেশভাগের ফলে আমাদের জন্মভূমি যদি পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে, আমরা যেন সকলে এক থাকি। ফেডারেশন ও লীগের কথায় না ভুলি। ভারতভূমিতে আমরা যেন সকলে এক সাথে চলে যেতে পারি। আমার অনুপস্থিতিতে আপনারা যেন সংঘবদ্ধ থাকেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করেন যা আমি আগেই আপনাদের বলেছি।'[১৫] যে সমাজের সর্বোচ্চ নেতাকে মুসলিমদের অত্যাচারের জন্য নিজের বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় ও যিনি পরিস্কারভাবে

তার ভক্তদের প্রতি তার বক্তব্য রেখে গেছেন - আজ সেই মতুয়া সমাজের কিছু নেতা বাংলাদেশের ইসলামি অত্যাচার নিয়ে ন্যূনতম কথাও বলেন না, বরং সভা করে দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রচার চালান। ‘‘উচ্চ’’বর্ণের বিরুদ্ধে লড়াই জারী রাখুন, কিন্তু বাংলাদেশের তফসিলী সমাজের উপর নির্মম অত্যাচারে নীরব থেকে, পশ্চিমবঙ্গের মৌলবাদী মুসলমান নেতৃত্বকে সমর্থন করে এ কোন পথে চলেছেন উদ্বাস্তুরা।

উদ্বাস্তুরা এখনও আসছেন। আসতে থাকবেন। যাঁরা ভাবছেন পশ্চিমবঙ্গে আমরা নিরাপদ তাঁরা যেমন অতীতকে লুকিয়ে রেখে অস্বীকার করতে চাইছেন তাঁরা অন্ধকার ভবিষ্যৎকেও দেখতে পারছেন না। আগামী কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গটাই বাংলাদেশ হয়ে যেতে পারে। আমাদের পুত্রকন্যা, পৌত্র-পুত্রীদের বরং আবার উদ্বাস্তু হবার জন্য তৈরি হতে বলাটাই ভালো।

---

[১] Hiranmoy Karlekar, Bangladesh – The Next Afghanisthan, pp 38, Sage Publications 2005

[২] B.R.Ambedkar, Pakistan or Partition of India, pp 116, Babashaeb Ambedkar Writings and Speeches, Vol. 8, Education Department, Government of Maharashtra, 1990.

[৩] Prafulla Chakrabarti, The Marginal Men, ‘Refugee Power and the Left’ pp 329-404, Lumierre Books, Kalyani, 1990;

[৪] Prafulla Chakrabarti ঐ. pp 94

[৫] Prafulla Chakrabarti ঐ. pp 142

[৬] Prafulla Chakrabarti ঐ. pp 143

[৭] Prafulla Chakrabarti ঐ. pp 151

[৮] Abdul Barkat et al – Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh- Living with Vested Property, pp 66-68, Pathak Samabesh, Dhaka, 2008.

[৯] Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council – Communal Discrimination in Bangladesh: Facts and Documents, pp 431-435, Dhaka 1993.

[১০] ঐ. pp 479-482

[১১] Mohammad Rafi, Can We Get Along, pp 201, Panjere Publications, Dhaka 2005

[১২] দেবজ্যোতি রায় - কেন উদ্বাস্তু হতে হলো - পৃ ১৭৫, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০১

[১৩] দিল্লিতে ৫ নভেম্বর ১৯৪৬এ এক জনসভায় যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বলেন 'হিন্দুদের আওতায় থাকিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করার চেয়ে মুসলমান অথবা অন্য কোন জাতির আওতায় স্বাধীন ও সম্মানের সহিত বাস করিতে তপশীলি জাতি বেশী পছন্দ করে।' মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ - জগদীশ মন্ডল, ১ম খন্ড, পৃ ২২১ (উদ্ধৃত -ভারত বিভাজন যোগেন্দ্রনাথ ও আম্বেদকর - শ্রীবিপদভঞ্জন বিশ্বাস, পৃ ১৫, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৩)

[১৪] ভারত বিভাজন যোগেন্দ্রনাথ ও আম্বেদকর - শ্রীবিপদভঞ্জন বিশ্বাস, পৃ ১২৭-৩২, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৩

[১৫] মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ - জগদীশ মন্ডল, ১ম খন্ড, পৃ ২২১ (উদ্ধৃত -ভারত বিভাজন যোগেন্দ্রনাথ ও আম্বেদকর - শ্রীবিপদভঞ্জন বিশ্বাস, পৃ ১৫, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৩)

(বহুস্বরে উদ্বাস্তু সত্তায় বাঙালি - সম্পাঃ সৌমেন চক্রবর্তী, মুক্তমন, ২০১২- তে প্রকাশিত)

বাংলাদেশ সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম বদলান হল না

গত ৩০শে জুন, ২০১১, বাংলাদেশ তার চল্লিশ বছরের ইতিহাসে আবার এক নতুন পর্বে প্রবেশ করল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগের প্রস্তাবে বাংলাদেশ সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হল। সংশোধিত সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রহামানির রহিম', রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার অধিকার বজায় রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায় একে বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরাও একে শেখ হাসিনার পশ্চাদপসরণ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে। বাংলাদেশের রাজনীতির এইসব খবর সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকারা ছাপে না, তবে এবার আনন্দবাজারে এ খবর প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও দুএকটি প্রতিবাদ অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। কি এই বিতর্কিত সংবিধান সংশোধন তা পর্যালোচনা করা যাক।

বাংলাদেশ চল্লিশ বছর আগে ছিল পূর্ব পাকিস্তান। দীর্ঘদিন সামরিক শাসনের পর ১৯৭০ সালের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে আওয়ামি লিগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয়ী হয়ে ৩০০ আসন বিশিষ্ট পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে একক শক্তিতে সরকার গঠনে যোগ্য হয়। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগের নিবাচনী বিখ্যাত ছয়দফা দাবীর মূল কথা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন। পাকিস্তানের ইসলামি শাসক গোষ্ঠী তা মেনে নিতে পারে নি। ফলে নির্বাচনী রায়কে অগ্রাহ্য করে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক শক্তি পূর্ব পাকিস্তানে

নামিয়ে আনল এক ভয়াবহ আক্রমণ। শুরু হল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধ। ভারতীয় সৈন্যদের বিপুল অংশগ্রহণে মাত্র নয় মাসে, ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিবর রহমান নতুন দেশের নেতৃত্বে আসীন হন।

১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান (আজকের বাংলাদেশ) ছিল পাকিস্তানের সংবিধানের অধীন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হলে তাতে দেশের নাম রাখা হল পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র। এতে বলা হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হবেন একজন মুসলমান, কোরান ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী আইন তৈরী করা হবে, প্রতিটি মুসলমানকে কোরান পড়া বাধ্যতামূলক করা হবে এবং পাকিস্তানের সমাজকে প্রকৃত ইসলামি রীতিতে পরিবর্তিত করতে ইসলামি গবেষণা ও সংগঠন গড়ে তোলা হবে। ১৯৬২তে জেনারেল আয়ুব খানের শাসনে সংবিধান সংশোধন করে শাসন প্রক্রিয়ায় কিছু বদল আনা হলো কিন্তু ইসলামি ভিত্তি একই থাকল।[১]

১৯৭২এ বাংলাদেশ গঠিত হবার পর নতুন সংবিধান তৈরীর প্রয়োজনীয়তা ছিল। ১৯৭০-এর আওয়ামি লিগের নির্বাচনী ইস্তাহারে বাঙালী জাতীয়তার স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলেও তাতে পাকিস্তানের সংবিধানের ইসলামি ভিত্তির বিরুদ্ধে কিছু ছিল না। কিন্তু নয় মাসের ইসলাম রক্ষার নামে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচার ও বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দলগুলির তাতে নির্লজ্জ সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভবতঃ মুজিবরের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশেষ পরিবর্তন আনে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনার প্রধান কাজ ছিল শহরে গ্রামে গিয়ে হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে মারা। হামুদার রহমান কমিশনের চেয়ারমান পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হামুদার রহমান বিস্ফোরক তথ্যাদি প্রকাশ করেন যার অন্যতম হিন্দুদের হত্যা করার জন্য

লিখিত নির্দেশ।[২] রাষ্ট্রীয় মদতে হত্যাকান্ডের উপর গবেষক আর জে রুমেলের বর্ণনা মনে করিয়ে দেয় নাৎসীদের ইহুদী পুরুষদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা -"সারা দেশ জুড়ে গণহত্যার ধরণটাই ছিল এই রকম। হিন্দুদের শনাক্ত করে ঘটনাস্থলেই হত্যা করা। এ জন্য সৈন্যরা পুরুষদের পরীক্ষা করে দেখতো 'ছুন্নত' করা আছে কিনা। থাকলে মুক্তি না থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু।"[৩] মূলত হিন্দু বাঙালীদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এল। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার ১৩% অর্থাৎ ১ কোটি লোক উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছিলেন। সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী ৬৭,৯৭,৬১৫ জন উদ্বাস্তু (শরণার্থী) সরকারি ক্যাম্পে ছিলেন, বাকি ৩১,০১,৬৬০ জন নিজেরাই কোনও ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। এই ক্যাম্পের ৯২.৭% উদ্বাস্তুই হিন্দু।[৮] এটা ধরে নেওয়াই যেতে পারে যে ক্যাম্পের বাইরে থাকা উদ্বাস্তুরা হিন্দু এবং আশ্রয় নিয়েছিল তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে। তাহলে মোট হিন্দু উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯১,৭৬,৬২৭। এদিকে ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের লোকগণনায় হিন্দুদের সংখ্যা দেখানো হচ্ছে ৯৬,৭৩,০০০। তার মানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত হিন্দুই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই গণহত্যায় হতভাগ্য হিন্দুরা ছাড়া মারা পড়েছিলেন আওয়ামি লিগের মুসলমান নেতা কর্মীরা।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে এই ব্যাপক বাঙালি হিন্দু গণহত্যার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু, বিশেষতঃ উদ্বাস্তু হিন্দুরা তাৎক্ষণিক আহা উহু করলেও এ নিয়ে মূলতঃ নীরব থেকেছেন। আর কলকাতার বিখ্যাত বাঙালি ঐতিহাসিককুলতো মধ্যযুগ বা বড়জোর উনবিংশ শতাব্দীর মৃতদেহ ঘাঁটার বাইরে আর যেতে সাহস করেন নি। ফলে একটি ব্যাপক গণহত্যার ইতিহাস লেখাই হল না। তবে ইদানীং বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী

সোচ্চার হওয়ায় বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় এই হিন্দু গণহত্যার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে।[৫]

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান লেখা হল ভারতীয় সংবিধানের ধারায় - একটি পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান। এই সংবিধানের ভিত্তি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। সংবিধানের ৮(১) ধারায় বলা হল যে রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নিয়ে কাজ করবে। ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে ১২নং ধারায় বলা হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হবে কোন ধর্মকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে না ও ধর্মের ভিত্তিতে কোন বৈষম্য করা হবে না। সংবিধানের ২৫ নং ধারায় আর্ন্তজাতিক প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির সাথে সমর্থন ঘোষণা করা হল। সংবিধানের ৩৮ নং ধারায় বলা হল সাম্প্রদায়িক দল বা সংগঠন গড়া নিষিদ্ধ। পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র থেকে একেবারে পাল্টে সৃষ্টি হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এরপর ১৯৭৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে মুজিবর একদলীয় শাসন চালু করলেও সংবিধানের মূল নীতি পরিবর্তিত হয় নি।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন নিজের বাসগৃহেই। ফিরে এল পাকিস্তানী আমল। বাংলাদেশের হিন্দুদের এই মাত্র সাড়ে তিনবছরের মুক্তি শেষ হয়ে গেল। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষুদ্র শক্তিটিরও দুর্দিন ঘনিয়ে এল। জিয়াউর রহমন প্রথমে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে এলেন। ক'দিন পর, ২৫ নভেম্বর আওয়ামি লিগের মুক্তিযুদ্ধকালীন নেতাদের কারাগারে হত্যা করে আওয়ামি লিগকেই একেবারে নিশ্চিহ্ন করা চেষ্টা করা হল। (একই চেষ্টা করা হয়েছিল জিয়াউর রহমনের বিধবা বেগম জিয়ার শাসন কালেও। ২০০৪-এর ২১ আগস্ট আওয়ামি লিগের সভায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ করে অনেককে হত্যা করা হয়, শেখ হাসিনা কোনক্রমে

বেঁচে যান)। একে একে মুজিব হত্যাকারীদের সাধারণ ক্ষমা করা হল, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দালালদের বিচারের অধ্যাদেশটি বাতিল করা হল। ১৯৭৬ সালের ৪ মে সংবিধানের ৩৮ নং ধারা বাতিল করে সাম্প্রদায়িক দল গঠন আইনী করে দেওয়া হল।

১৯৭৭ এর ২১ এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজেকে দেশের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলেন। এর দুদিন পরেই, ১৯৭৭-এর ২৩ এপ্রিল ৫ম সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথম ইসলামিকরণ শুরু হল। এতে বাঙ্গালি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা শুরু হল। মৌলিক নীতির ৮(১) ধারার শুরুতে সর্বশক্তিমান আল্লার উপর পরম বিশ্বাস ও আস্থার নীতি সংযোজিত হল। এর সাথে ৮(১ক) একটি নতুন ধারা জুড়ে দেওয়া হল যাতে বলা হল 'সর্বশক্তিমান আল্লার উপর পরম বিশ্বাস ও আস্থাই হবে সমস্ত কাজের ভিত্তি'। ধর্মনিরপেক্ষতার ১২নং ধারাটি বাদ দেওয়া হল। ২৫নং ধারায় একটি নতুন উপধারা জুড়ে দেওয়া হল যাতে বলা হল 'রাষ্ট্র মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বকে জোরদার করতে সচেষ্ট হবে'। সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রহামানির রহিম' যুক্ত করা হল। অর্থাৎ বাংলাদেশকে ইসলামি দুনিয়ার অংশ করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হল। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিষোদগারের পাকিস্তানি মুখপাত্র শাহ আজিজুর রহমানকে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী করা হল।[৬]

এই পরিবর্তনকে অল্প কথায় ব্যাখ্যা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের খ্যাতনামা অধ্যাপক মুনতাসির মামুন -

'জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা বদলে গেল। বাঙালির বদলে তা হয়ে গেল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, যার মধ্যে ধর্মের উপাদান মিশ্রিত। জিয়ার ভাষায়, এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হল, রেস বা জনগোষ্ঠী,

স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাংলা ভাষা, ধর্ম, ভৌগলিক এলাকা (মাটি), সংস্কৃতি, অর্থনীতি। এখানে লক্ষণীয়, মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেল স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ধর্ম হল ইসলাম। সমাজতন্ত্র অবশ্যই অর্ন্তহিত হল, এর সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাও। শুধু তাই নয়, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের রাজনীতি করার স্বাধীনতা দেয়া হল এবং কোলাবরেটরদের মুক্তি দেওয়া হল। এর ফলে বাংলাদেশে নতুন এক দলের বা গ্রুপের সৃষ্টি হল যাদের বলা হয় স্বাধীনতাবিরোধী। এতে অর্ন্তগত জামাতে ইসলামি, বিভিন্ন ছোট ছোট দক্ষিণপন্থী দল ও ব্যক্তি বা সংগঠিত ছোট ছোট গ্রুপ। একটি স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে একটি বড় গ্রুপের আবির্ভাব খুব সম্ভবত বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ তিন দশকের সামরিক ও দক্ষিণপন্থী শাসনে তা পুষ্ট হয়ে প্রভাবশালী একটি দলে পরিণত হয়েছে।''[৭]

১৯৮১ সালে জেনারেল জিয়া খুন হলে ১৯৮২ সালে হুসেন মহম্মদ এরসাদ সামরিক ক্ষমতা দখল করলেন। জেনারেল জিয়ার সামরিক শাসনে ১৯৭৯তে নির্বাচনে জেনারেল জিয়ার দল বাংলাদেশ ন্যাশানাল পার্টি (বিএনপি) বিপুলভাবে জয়যুক্ত হয়। একইভাবে ১৯৮৬ সালে এরসাদ নির্বাচন করে, তাঁর নিজের তৈরী দল জাতীয় পার্টি বিপুলভাবে জয়ী হয়। ১৯৮২তে এসে এরসাদ ইসলামিকরণের দিকে দ্রুত হাঁটতে শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি শহীদ মিনারে আল্পনা আঁকা নিষিদ্ধ করে সেখানে কোরান পাঠের ব্যবস্থা করেন। এর পর ১৯৮৮ সালের ৯ জুন ৮ম সংশোধনীর দ্বারা জেনারেল এরসাদ সংবিধানে একটি নতুন ধারা 2A যুক্ত করেন। এতে ঘোষণা করা হল যে 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'। এর ফলে ১৯৮৮ থেকে অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হলেন। দুঃখের কথা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বাংলাদেশের ভয়াবহ খবর থেকে খুব সচেতনভাবে অজ্ঞ করে রাখে এখানকার

বিকৃত-ধর্মনিরপেক্ষী বুদ্ধিজীবি, ঐতিহাসিক, মানবাধিকারওয়ালা, বামপন্থী ও সংবাদমাধ্যম - প্রায় সবাই। ফলে এহেন কুখ্যাত হুসেন মহম্মদ এরসাদকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের হিন্দুরা তাদের ঘরের ছেলে 'পেয়ারা দা' বলে সম্বর্ধনা দিলেন বছর খানেক আগে।

এরসাদের পতনের পর ১৯৯৬ সালে দীর্ঘদিন পর মুক্ত আবহাওয়ায় নিবার্চনে স্বল্প সংখ্যাধিক্যে আওয়ামী লিগ ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এই সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে আওয়ামী লিগ কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে বাংলাদেশ ন্যাশানাল পার্টি (বিএনপি) ক্ষমতায় আসে। এই নির্বাচনের সময় ও পরে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নেমে আসে প্রবল আক্রমণ। ১৯৭১ সালের পর আবার ২০০১-এ কয়েক লক্ষ হিন্দু ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত মানবাধিকারওয়ালারা নীরব থাকে। এর প্রতিবাদে ২০০৩-এ কলকাতার মানবাধিকার কর্মীরা ক্যাম্ব (Campaign Against Atrocities on Minorities in Bangladesh - CAAMB) সংগঠন গড়ে প্রথম পশ্চিমবঙ্গে (ও ভারতে) জনসাধারণকে বাংলাদেশের প্রকৃত তথ্য জানাতে শুরু করে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ক্রমাগত আভ্যন্তরীন সমস্যায় নির্বাচন হয় নি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লিগ ৩০০টি আসনের মধ্যে একাই ২৩০টি আসন জিতে ক্ষমতায় আসে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লিগের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান) ব্যাপকভাবে আওয়ামি লীগের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামি লীগের কাছে তিনটি প্রত্যাশা ছিল - ১) যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার ২) হিন্দুবিরোধী অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল ও ৩) ৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তন। যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের

কাজ কিছুটা শুরু হলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দুটি প্রতিশ্রুতিতেই শেখ হাসিনা তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা হরিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের মুক্তমনা মানুষেরা এই ইসলামি আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করবার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন আগেই তাঁরা সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। এই খ্যাতনামা পনেরজন আবেদনকারীদের মধ্যে পাঁচজন এখন মৃত, এঁরা হলেন - বেগম সুফিয়া কামাল, বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য, বিচারপতি কে এম সুভান, ব্যারিস্টার সৈয়দ ইসতিহাক আহমেদ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কলিম শরাফী। বাকিরা হলেন বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন, জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক সারোয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক মোশারফ হোসেন, মেজ জেনারেল সি আর দত্ত, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর, লেখক ফয়েজ আহমেদ, বোরহানউদ্দিন খান এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জমান। এঁদের আবেদনে সম্প্রতি ৮ জুন ২০১১তে সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশ সরকারকে কেন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখা হবে তার কারণ দর্শাতে বলে। সরকারে উত্তর এখনও জানা যায় নি।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এইসব সামরিক শাসনকালের সংশোধানীগুলি অবৈধ বলে ও সংবিধানকে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে প্রত্যাবর্তনের উপদেশ দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করে সংবিধান সংশোধনের পদক্ষেপ নেন। শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে ঘাতক দালাল নির্মূলকমিটি ও মহম্মদ হামিদ, কামাল লোহানীদের বাহাত্তরের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি ও অন্যান্য সংগঠন এই দাবীর পক্ষে সোচ্চার হয়।

দুঃখের বিষয় গত ৩০জুন ২০১১ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে যে পঞ্চদশ সংবিধান

সংশোধনী গৃহীত হয়েছে তাতে আমরা উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। নতুন সংশোধনে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পুনরায় অর্ন্তভুক্ত করা হলেও এবং 'সর্বশক্তিমান আল্লার উপর পরম বিশ্বাস ও আস্থাই হবে সমস্ত কাজের ভিত্তি' বাদ দেওয়ার পরও সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রহামানির রহিম', রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার অধিকার বজায় রাখা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা সহ সংখ্যালঘু হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসীরা ক্ষুব্ধ। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ধর্মীয় শক্তিগুলিই আবার প্রশ্রয় পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ একে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করছে। আগামী নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আর অংশগ্রহণ করবেন কিনা তাও বিবেচনা করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা উচিত যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পলিটিক্যালি কারেক্ট সেকুলার আবহে প্রায় সবাই প্রকাশ্য সভায় বলে থাকেন যে বাংলাদেশের মুসলমানরা মূলতঃ সেকুলার, এসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক চক্রান্ত। কথাটি সর্বৈব অসত্য। প্রখ্যাত অধ্যাপক আবুল বরকত তাঁর Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh- Living with Vested Property বইয়ে হিসাব করে বলেছেন যে ১৯৭১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে ৬৩ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে উধাও হয়ে গেছেন। এই হিন্দু বিতাড়নটি করেছে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানরাই। এই বিতাড়নে হিন্দু সম্পত্তি দখলের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৩১% আওয়ামি লিগের সদস্য-সমর্থক ও ৪৫% বিনপির সদস্য-সমর্থক। তাছাড়া সারা দুনিয়াতে যে ভয়ংকর ইসলামি ঢেউ চলছে, মাল্টি কালচারালিজমের (সাংস্কৃতিক বহুত্ব) নামে বোরখার পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে পশ্চিমী লিবারেলরা,

পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা স্থাপনের প্রতিযোগিতা চলছে সেই পরিস্থিতিতে হঠাৎ বাংলাদেশের মুসলমানরা কোন দুঃখে সেকুলার হতে যাবেন? আওয়ামি লিগ তাই রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নির্বাচনের আগে সেকুলার হয় আবার ইসলামিও হয়। ২০০৬ সালে যখন নির্বাচন হবার কথা ছিল তখন আওয়ামি লিগ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সঙ্গে একটি প্রকাশ্য নির্বাচনী সমঝোতায় স্বাক্ষর করে বলে নির্বাচনী বিজয়ের পর যে বিষয়গুলি বাস্তবায়ন করবে তা হল - ১। পবিত্র কুরআন সুন্নাহ্ ও শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না। ২। কওমী মাদারাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। ৩। নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে ঃ(ক) হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।(খ) সনদ প্রাপ্ত হক্কানী আলেমগন ফতওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন। সনদ বিহীন কোন ব্যাক্তি ফতওয়া প্রদান করতে পারবেনা।(গ) নবী-রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করা দন্ডনীয় অপরাধ। বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদীদের দ্বারা নিগৃহীত খ্যাতনামা মানবাধিকার নেতা শাহরিয়ার কবির লিখছেন - 'জনসভার ব্যানার ও পোস্টারের উপর জয় বাংলা ও জয় বঙ্গবন্ধু-র মাঝখানে আল্লাহু আকবর বা আল্লাহ সর্বশক্তিমান লিখে বিসমিল্লাহ .... বলে বক্তৃতা আরম্ভ করে আর যাই হোক ধর্মনিরপেক্ষ বা অসম্প্রদায়িক হওয়া যায় না।'[৯]

এটাও ঘটনা যে শেখ হাসিনাকে এক ভয়ংকর পাকিস্তানপন্থী ইসলামি শক্তির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে ২০০১ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর হিন্দুত্ববাদি বিজেপি সরকার এই শক্তিকে ক্ষমতায় আসতে পরোক্ষে সাহায্য করেছিল। বেগম জিয়া নির্বাচনে জেতার পর তাঁকে ঢাকায় প্রথম অভিনন্দন জানাতে ছোটেন অটলবিহারীর ব্যক্তিগত সচিব ব্রজেশ মিশ্র। সংবিধান থেকে

সর্বশক্তিমান আল্লার উপর পরম বিশ্বাস ও আস্থার নীতি বাদ দেওয়াতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলি। তসলিমাকে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের ইমামরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দশ হাজার মাদ্রাসা স্থাপনের প্রতিশ্রুতিতে, সিপিআইএমের দীর্ঘদিনের ইসলামি মৌলবাদের তোষণে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিদদ্বজন/ বুদ্ধিজীবিদের ইসলামি মৌলবাদের পক্ষে নীরব সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও বাংলাদেশের ইসলামি মৌলবাদের পক্ষেই থাকবেন। আমাদের এখন আরো ভয়াবহ দিনের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি বা করার আছে?

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ

দেশ	রাষ্ট্রধর্ম
আফগানিস্তান	ইসলাম
মালদ্বীপ	ইসলাম
পাকিস্তান	ইসলাম
বাংলাদেশ	ইসলাম

অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ

দেশ	রাষ্ট্রধর্ম
শ্রীলংকা	
ভারত	নেই
নেপাল	
ভুটান	

[১] http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Pakistan_of_1956

[২] Tathagato Roy, My People Uprooted – pp 227, Ratna Prakashan, Calcutta, 2001.

[৩] R. J. Rummel, Irving Louis Horowitz, *Death by Government*, pp 323, Transaction Publishers, 1997

[৪] Refugees from Bangladesh: Facts of the Refugee Problem, *Bangladesh Documents*, Ministry of External Affairs, Government of India, Printed at B.N.K. Press, Madras (Chennai), 1971, pg.81 & 446, Quoted in Illegal Immigration From Bangladesh To India: The Emerging Conflicts, Chandan Nandy, Brandeis University, 2005

[৫] উত্তরাধিকার' ৭১ - জানুয়ারি ২০১০, আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, ঢাকা

[৬] Hiranmay Karlekar – Bangladesh – The Next Afghanistan? PP-51-52, Sage Publications, New Delhi, 2005

[৭] মুনতাসির মামুন - রাজাকার সমগ্র পৃঃ ৫২৫, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৯

[৮] Abul Barquat – Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh : Living with Vested Property, p-108, Pathak Shamabesh, Dhaka, 2008

৯ শাহরিয়ার কবির - শ্বেতপত্র - বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন, পৃঃ ২৭, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ২০০৫

(দেশকাল ভাবনা - ২০ জুলাই, ২০১২)

বাংলাদেশে ৭১ এর গণহত্যাকারীদের বিচার শুরু হয়েছে - পশ্চিমবঙ্গের নীরবতা জামাতের হাতই শক্ত করছে

'একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার - মুক্তিযোদ্ধাদের স্লোগানে প্রকম্পিত রাজপথ। বিকেল ৩টা ৫৫ মিনিট। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে মুক্তিযোদ্ধা কন্টিনজেন্টের শত শত সদস্য সুসজ্জিত পোশাকও কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুত। হাতে জাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকা। পেছনে একাত্তরের রণাঙ্গনের হাজারো সঙ্গী। সঙ্গে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি সংবলিত ব্যানার। বাজছে বিজয়ের মাসের বাদ্যযন্ত্র, বিজয়ের গান। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক চারটা হতেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ঞ্জজয় বাংলাঞ্চ স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে উঠল শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ। একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো ঢাকার রাজপথ। যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি দিতে হবে - স্লোগানে স্লোগানে বজ্রমুষ্টি দৃঢ় হয়ে জেগে উঠল। সেই বজ্রমুষ্টির দাবি শহীদ মিনারের তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল শহরের প্রতিটি প্রান্তরে। মুক্তিকামী মানুষের একাত্ম আওয়াজ প্রতিধ্বনি হয়ে আসতেই শুরু হলো বিজয় র‍্যালি।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল র‍্যালিটি দোয়েল চত্বর ঘুরে আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে দিয়ে শিক্ষা ভবন মোড় মৎস্য ভবন হয়ে সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তনে এসে শেষ হয়। পরে শিখা চিরন্তন চত্বরে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধাবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব) এবি তাজুল ইসলাম বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালে যত ষড়যন্ত্রই হোক, কেউ এ বিচার ঠেকাতে পারবে না। আইন প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট কামরুল

ইসলাম বলেন, দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে যে বিভাজন রয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করে সেই বিভাজন চিরতরে দূর করা হবে।' (জনকণ্ঠ, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১২)

বাংলাদেশে, ঢাকায় গত দুই বছর ধরে শুরু হয়েছে আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল যার কাজ ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে গণহত্যা, নারীনির্যাতন ইত্যাদি অমানবিক কার্যকলাপের নেতাদের বিচার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাজী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য নুরেমবার্গ বিচার এখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সাম্প্রতিক কালে রুয়ান্ডা, বসনিয়ায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে আর্ন্তজাতিক আদালতে। বাংলাদেশের এই বিচার নুরেমবার্গ বিচারের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ অপরাধগুলি ঘটিত হয়েছে ৪০ বছর আগে। বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনালে এখন বিচার শুরু হয়েছে সাত কুখ্যাত জামায়েত ইসলামী নেতার। এদের নাম হল - মৌলানা মতিউর রহমান নিজাম, গোলাম আজম, আব্দুস সোহান, দেলোয়ার সাঈদি, মহম্মদ কামারুজ্জমান, আব্দুল কাদের মোল্লা, মহম্মদ মুজাহিদ, আজহারুল ইসলাম, মীর কাসেম আলি। বিচার যতই এগুচ্ছে, আদালতে অত্যাচারিতদের দেওয়া বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রপত্রিকায়, মানুষের ঘৃণা ঘনীভূত হচ্ছে এই নরপশুদের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এখন রোজ এই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে অথচ পশ্চিমবঙ্গ কিছু জানেই না। এই আমাদের সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, সমাজবিদ, রাজনীতিবিদদের সচেতনতা। শুধুমাত্র কলকাতা থেকে প্রকাশিত সারদা গ্রুপের ইসলামি দৈনিক কলম পত্রিকায় এই বিচারের বিরূদ্ধে খবর মাঝেমাঝে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিজয় দিবস। চল্লিশ বছর আগে এই দিনে ভারতীয় সেনা ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি ফৌজ। জন্ম নেয়

এক নতুন রাষ্ট্র - বাংলাদেশ। পৃথিবীর ইতিহাসে এত স্বল্প সময়ের (নয় মাস) সশস্ত্র সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে নতুন দেশ সৃষ্টি করার নজির আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। সময় স্বল্প হলেও স্বাধীনতা অর্জনের মূল্য স্বল্প ছিল না। এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, লক্ষাধিক নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে। এই তিরিশ লক্ষ প্রাণ যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদ হয় নি, এই তিরিশ লক্ষ নারী পুরুষ শিশু শিকার হয়েছিলেন এক সুপরিকল্পিত নৃশংস গণহত্যার।

এই গণহত্যার শুরু ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ। বাঙালীদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাস্তায় নামে পাকিস্তানি সেনা। আক্রান্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, ছাত্রিনিবাস, অধ্যাপকদের বাসস্থান। নির্বিচারে হতাকন্ড চালায় তারা। একই সঙ্গে আক্রান্ত হয় ঢাকা শহরের হিন্দু প্রধান অঞ্চল শাঁখরীপাড়া। ধ্বংস করা হয় পাঁচশ বছরের পুরানো রমনা কালী মন্দির, আনন্দময়ী মার আশ্রম। হত্যা করা হয় মন্দিরের পূজারীদের। অবিলম্বে এই মরণযজ্ঞ শুরু করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশ) অন্যান্য শহরে ও জনপদে। প্রথম চার পাঁচ দিনে শুধু ঢাকা শহরেই মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় পঞ্চাশ হাজারের উপর। নয় মাস পরে সারা দেশে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় তিরিশ লক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের ষাট লক্ষ ইহুদী হত্যার পর এত বড় গণহত্যা দুনিয়ার কোথাও সংগঠিত হয়নি। পাকিস্তানি সেনাকে এই নির্মম মারণযজ্ঞ চালাতে আল বদর, আল সামস, রাজাকার ইত্যাদি সংগঠন গড়ে সক্রিয় সহায়তা করেছিল এক দল পাকিস্তানপ্রেমী, ইসলামী মৌলবাদী বাঙালী। মূলত হিন্দু বাঙালীদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এল। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী যে হত্যালীলা চালায় তাতে বহু বাঙালী মুসলমান মারা গেলেও সুপরিকল্পিত ভাবে মূলতঃ হিন্দুদের হত্যা

করা হয়। হামুদার রহমান কমিশনের চেয়ারমান পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হামুদার রহমান বিস্ফোরক তথ্যাদি প্রকাশ করেন যার অন্যতম হিন্দুদের হত্যা করার জন্য লিখিত নির্দেশ। রাষ্ট্রীয় মদতে হত্যাকান্ডের উপর গবেষক আর জে রুমেলের বর্ণনা মনে করিয়ে দেয় নাৎসীদের ইহুদী পুরুষদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা -ঞ্জঞ্জসারা দেশ জুড়ে গণহত্যার ধরণটাই ছিল এই রকম। হিন্দুদের শনাক্ত করে ঘটনাস্থলেই হত্যা করা। এ জন্য সৈন্যরা পুরুষদের পরীক্ষা করে দেখতো 'ছুন্নত' করা আছে কিনা। থাকলে মুক্তি না থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু।'' বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে এই গণহত্যাকারী ইসলামি নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা বড় অংশ বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের গণহত্যা। তবু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, এমনকি কপালে তিলক কাটা টিকি ওড়ানো ধর্মব্যবসায়ীরাও এই বিচার নিয়ে নীরব।

গণহত্যাকারী, নারী ধর্ষণকারী এই নরপশুদের বিচার ও শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে গঠন করা হয় এক ট্রাইব্যুনাল। এই ট্রাইব্যুনাল কাজ শুরু করার আগেই ১৯৭৫ সালে পাকিস্তানপন্থী সামরিক আফিসারদের হাতে খুন হন স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবর রহমান। মুসলমান-হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ বাঙালীর যৌথসংগ্রাম ও আত্মবলিদানে এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সামরিক ও নৈতিক সহায়তায় জন্মলাভকরা ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের চরিত্র বদলে যায় এই হত্যাকান্ডে। পরিণত হয় যেন বাংলাভাষী পাকিস্তানে। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশে বিদেশে আত্মগোপন করে থাকা পাকিস্তানপ্রেমী, ইসলামী মৌলবাদী, গণহত্যাকারী, নারী ধর্ষণকারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ফিরিয়ে আনেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জিয়ায়ুর রহমান। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের গদিতে আসীন হওয়া জিয়াউর প্রাণ হারালেন আরেক সামরিক অভ্যুত্থানে। কিন্তু বাংলাদেশের ভাগ্য

ফিরল না। পরবর্তী সামরিক শাসক এরশাদ সরকারী ভাবে ঘোষণা দিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ইসলাম ও ভারত বিরোধিতা কে কাজে লাগিয়ে এর পরে শাসন ক্ষমতায় এলেন জিয়ায়ুর রহমানের বিধবা বেগম জিয়া। তিনি সরকার গড়লেন সেই ইসলামী মৌলবাদী, গণহত্যাকারীদের পার্টি জামায়েত-এ-ইসলামীর সঙ্গে। মন্ত্রী বানালেন ইসলামী মৌলবাদী, গণহত্যাকারী, নারী ধর্ষণকারীদের। তার প্রত্যক্ষ প্রমান - ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পরদিনই বেগম জিয়ার দল বিনপি আর জামায়েত সারা বাংলাদেশ জুড়ে সংগঠিত করে হিন্দুদের উপর আক্রমন। লুণ্ঠিত হয় হাজার হাজার হিন্দুর ঘরবাড়ি, সম্ভ্রাম হারান শত শত হিন্দু নারী।

মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৮ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লিগ। তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির একটি ছিল মানবধবিরোধী এই ইসলামী নরপশুদের বিচার ও শাস্তি প্রদান। স্বাধীন ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবরের স্বপ্নকে সাকার করা। পুনর্জীবিত করা হয় ১৯৭৩ সালের ট্রাইব্যুনাল। সেই ট্রাইব্যুনালে এখন বিচার শুরু হয়েছে সাত কুখ্যাত জামায়েত ইসলামী নেতা মৌলানা মতিউর রহমান নিজাম, গোলাম আজম, আব্দুস সোহান, দেলোয়ার সাঈদি, মহম্মদ কামারুজ্জমান, আব্দুল কাদের মোল্লা, মহম্মদ মুজাহিদ, আজহারুল ইসলাম, মীর কাসেম আলির। আদালতে অবস্থা সুবিধার নয় বুঝে তাই রাস্তায় নেমে হিংসা ছড়ানো শুরু করেছে জামায়েত-এ-ইসলামী, সঙ্গে দোসর হয়েছে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। বাংলাদেশে এই মৌলবাদীরা এতই সক্রিয় যে এই বিচারে যারা লিখিত সাক্ষ্য দিয়েছেন এরকম চল্লিশ জনের মতন সাক্ষী ভয়ে আর এই ট্রাইবুনালের সামনে সশরীরে না হাজির হয়ে লুকিয়ে রয়েছেন, কেউ কেউ ভারতে চলে এসেছেন। এই বিচারের ১৩ জন সরকারপক্ষের আইনজীবির

অন্যতম হচ্ছেন আইনজীবি ও বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত। সম্প্রতি রানা দাশগুপ্ত কলকাতায় এলেও কোন সংবাদপত্র তাকে যোগাযোগ করল না।

মনে রাখতে হবে এই যুদ্ধপরাধীদের বিচার সারা পৃথিবীর জন্য ও বিশেষ করে দুই বাংলার বাঙালির জন্য বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই অপরাধের বিচার শুরু হবার কথা ছিল ১৯৭৩-এই, ঘটনার দু-তিন বছর পরেই। কিন্তু তা শুরু হল ৪০ বছর পরে। এত দিন পরে এই বিচার আইন ব্যবস্থার ছাত্রদের জন্য জানা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিচারে বাধা আনতে ইসলামি মৌলবাদীরা ইউরোপে এর বিরুদ্ধে আইনী দুর্বলতার প্রচার চালাচ্ছে। গণহত্যাকারীদের নীরব সমর্থকরা সক্রিয় আমাদের পশ্চিম বাংলায়ও। এদের চোখরাঙ্গানিতে কলকাতা ছাড়া হয়েছেন তসলিমা নাসরীন। এদের দোসররাই পুজা বন্ধ করেছে দেগঙ্গা ও তেহট্রে। বাংলাদেশে যখন জামায়েতের শীর্ষ নেতারা খুনের অপরাধে জেলে রয়েছেন তখন পশ্চিমবঙ্গে জামায়েত নামের সংগঠনরা জাতে উঠে বুক ফুলিয়ে রাজনীতির সামনের সারিতে এসে গেছেন, দলিত-মুসলিম ঐক্যের ফেরীওয়ালা কিছু হিন্দু উদ্বাস্তু তাদের সাথে হাত মিলিয়ে মিছিল-মিটিং করছেন। এমনকি এই দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রচারে প্রাক্তন নকশাল নেতারাও জামাতের হাত ধরে মঞ্চে উঠছেন, এসে গেছেন কমরেড আল-হজ্জ্ব রেজ্জাক মোল্লাও। আর আগেই বলেছি কলম দৈনিক পত্রিকাটি (সম্পাদকঃ সুদীপ্ত সেন, কার্যকারী সম্পাঃ আহমেদ হাসান, সিইওঃ কৃণাল ঘোষ) এই ইসলামি মৌলবাদী বার্তা পৌছে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের ঘরে ঘরে।

হিটলারের ষাট লক্ষ ইহুদী হত্যার বিচার হয়েছিল ন্যুরেমবারগে। সেই বিচার নিয়ে পশ্চিম বাংলায় অনেক প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা লেখা হয়েছে। অথচ প্রতিবাশী দেশে ন্যুরেমবারগ বিচারের মতন এত বড়

একটা ঐতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা নিয়ে কোন হেলদোল নেই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ও রাজনৈতিক দলগুলির। সুদূর ইরাক বা ফিলিস্তানে কি হল না হল তা নিয়ে পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীরা কবিতা লিখে পাতা ভরান তারা এবং তাদের সহমর্মীরা মাথায় সাদা টুপী পড়ে রাস্তা ভরান। আবুঘারিব নিয়ে ছবি আঁকেন। কিন্তু গণহত্যাকারীদের বিচার নিয়ে তারা নিশ্চুপ। আমাদের অশীতিপর মিত্র-রায়চৌধুরিরা এখনও পঞ্চাশ বছর ধরে ভুঁয়ো সেকুলারিজমের ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছেন, দারুণ খুশী জামায়েতপন্থীরা। এমনকি এই মানবতা বিরোধী অপরাধীদের সমর্থক ও হিন্দু নির্যাতনের নেত্রী বেগম জিয়াকে সম্প্রতি স্বাগত জানাতে দিল্লিতে হাজির হয় বিজেপির সমস্ত প্রথম সারির নেতাগণ।

অথচ বাংলাদেশের মুক্তমনা মানুষেরা এই জামাত ধরণের রাজনীতিকে দূর করতে আরো সচেষ্ট হয়েছেন। ‘সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জাতীয় সম্মেলন। গতকাল দিনব্যাপী এ সম্মেলনের ঘোষণপত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নবীন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারণের ওপরও জোর দেয়া হয়। এর পাশাপাশি রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করে সংবিধান থেকে ধর্মীয় উপাদানগুলো বাদ দেয়ার দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে বাম ও সেক্যুলারপন্থী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা অংশ নেন। মহানগর নাট্যমঞ্চে এ সম্মেলনের আয়োজক ছিলেন অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, লেখক সৈয়দ শামসুল হক, সাংবাদিক বোরহানুদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সাংবাদিক কামাল লোহানী, রামেন্দু মজুমদার, সেলিনা হোসেন, হামিদা হোসেন, সুলতানা কামাল ও মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তাদের আহ্বানে সম্মেলনে উপস্থিত হন

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ, জাসদ নেতা ও তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতা মুনতাসির মামুন, বৌদ্ধধর্মীয় নেতা জ্যোতির্ময় বড়ুয়াসহ বাসদ, গণঐক্য, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম, সাম্যবাদী দল, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি পরিষদ, ছাত্র ইউনিয়ন, সুশাসনের জন্য নাগরিক, আহমদিয়া মুসলিম জামায়ত, তরিকত ফেডারেশনও এ সম্মেলনে সংহতি জানায়।' (আমার দেশ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১২)

(দেশকাল ভাবনা - ৫জানুয়ারি, ২০১৩)

অশান্ত বোড়োভূমি
পৃথিবীব্যাপী ইসলামী সম্প্রসারণের খন্ডচিত্র

হঠাৎ বোড়োভূমিতে অশান্তি কেন? হঠাৎ নয়, বোড়োভূমি অশান্ত গত কুড়ি বছর ধরে। শুধু বড়োভূমি নয় এই অশান্তি এখন অসমের অনেক অংশেই, এই সমস্যা নাগাল্যান্ডে, মিজোরামেও। সমস্যাটা আদৌ বোড়োদের বা সেখানের মুসলমানদের কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নয় এটি একটি সাধারণ সমস্যার একটি স্থানিক বিস্ফোরণ মাত্র। ফলে আগে একটু অসম নিয়ে আলোচনা হয়ে যাক।

মুসলিম লীগের অসম

আজকের অসমের ইতিহাসের শুরু ১৮২০ সাল নাগাদ যখন ব্রিটিশরা বর্তমান অসমের অনেকটা অংশ দখল করে। এর আগে অসমে বিভিন্ন রাজারা রাজত্ব করেছেন, অসমে মুসলমান অভিযান হয়েছে তবে পুরো অসম কখনো মুসলমান শাসনের অধীন হয় নি। মোগল আমল থেকে কিছু মুসলমান আসামে বসবাস শুরু করলেও মূল অসমে মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। এছাড়া অসমের গায়ে জড়িয়ে ছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্রজাতিদের রাজ্য যেমন কাছাড়ি, নাগা, গারো, জয়ন্তিয়া ইত্যাদি। ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে এদের সরাসরি দখল করে অসমে জুড়ে দেয় বা অধীন রাজ্য হিসাবে রাখে। ১৮৭৮ সাল থেকে সম্পূর্ণ বাংলাভাষী শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলাকে জুড়ে দেওয়া হয় অসমের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রচারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এই শ্রীহট্ট জেলা। বর্তমান ঢাকা বিমানবন্দরের নাম হজরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর। মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেনজাত এই অবাঙালি ইসলামি ধর্মযোদ্ধা (যাদের সুফি বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়) শ্রীহট্টের

হিন্দু রাজত্ব ধ্বংসের ও পরে ব্যাপক ইসলামে ধর্মান্তরকরণের নায়ক। ব্রিটিশ শাসিত এই বিরাট অঞ্চলের নাম অসম রাখাটাই প্রাথমিক সমস্যার জন্ম দেয়। অবশ্য এটা কোন নতুন ঘটনা নয় যেমন বাংলার মানচিত্রে যুক্ত দার্জিলিঙ এমনকি সিকিম-তিব্বত সীমান্তের কানচেনজোঙ্গা-কে কাঞ্চনজঙ্ঘা বানিয়ে হিন্দু বাঙালি তাকে বাঙলার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ভাবতে শিখেছে। শ্রীহট্টের অসমে যোগদানে ব্রিটিশ অসমে মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। স্বাধীনতা ও দেশভাগের আগে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অসমে মূলতঃ ছিল মুসলিম লীগের শাসন আর তার প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) ছিলেন স্যর সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা। বাগদাদ থেকে এসে অসমে বসবাসকারী এই পরিবার আসামের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাদুল্লা-র কৃতিত্ব যে তিনি দক্ষিণ অসমে পরিকল্পিত ভাবে বাঙালি মুসলমান কৃষকদের বসতির ব্যবস্থা করে এই অংশের জনমানচিত্র পাল্টে দেন। নীচে এই সংক্রান্ত সারনীতে তা দেখা যাবে। যদিও ১৮৩৬ সালেই অসমের সরকারি ভাষা হয়ে যায় অসমিয়া, তবুও বাংলার গুরুত্ব ছিল, শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর দাপট ছিল চাকরিবাকরিতে। জিন্নার দাবী ছিল মুসলিম লীগ শাসিত পুরো অসমকেই পাকিস্তানে অর্ন্তভুক্ত করা। বর্তমানের বাংলাদেশের বৃহত্তর বাংলার দাবীদাররা অসমকেও বাঙালি মুসলমানের স্বাভাবিক বাসভূমি বলেই মনে করেন।

স্বাধীনতার পরে অসম

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় অসমিয়ারা তাই শ্রীহট্টের বোঝাটি অসমের ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেললেন। এক বিতর্কিত গণভোটে শ্রীহট্ট পূর্ব পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হল। শ্রীহট্টের বাঙালি হিন্দুর দুঃখের কথা অসমিয়াদের ভাবার কথাও ছিল না। তবু এক কোণে সম্পূর্ণ বাংলাভাষী কাছাড় অঞ্চলটি রয়ে গেল বর্তমান অসমের সঙ্গে।

স্বাধীনতার পরে এই নতুন অসমে অসমীয়া জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অসমের বাঙালি হিন্দু অধিবাসীদের বিরুদ্ধে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে খুব সহজে জয়লাভ করে। এসময় ব্যাপক গরীব কৃষক বাঙলাভাষী মুসলমান যারা তাদের মুসলমান পরিচিতির বাইরে কখনো বাঙালি জাতীয়তাবাদে মাথা ঘামান নি, তাঁরা নিজেদের নব-অসমিয়া পরিচিতি দিতে থাকলেন, জনগণনায় অসমিয়াভাষীদের সংখ্যা বেড়ে গেল অনেক। অবশ্য 'বঙ্গাল খেদা'-র জয়ের মূল কারণ বাঙালি হিন্দু মূলতঃ কাপুরুষ, প্রতিরোধ করে থেকে যাওয়া তার চরিত্রে নেই। বাঙালি হিন্দু অসম (ও বর্তমান মেঘালয়) থেকে কিছু পালাল, অসমে নতুন করে যাওয়া বন্ধ হল আর বাকিরা যতটা সম্ভব অসমে অদৃশ্য থেকে রয়ে গেল। আজকের গৌহাটিতেও বাঙালি হিন্দু প্রচুর থাকলেও কোন বাঙালি সাইনবোর্ড বা বাঙালি হিন্দুর নামের দোকানপাট পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য এ নতুন কিছু নয়, বাঙালি হিন্দু ঝামেলা এলেই পালায়, একসময় বর্মা থেকে পালিয়েছে, তারপর আসাম থেকে, পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে। এখন পালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গেই পার্ক সার্কাস বা নদীয়া, দেগঙ্গা, সব সীমান্ত অঞ্চল থেকে। তিনশ বছর আগে ইংরেজরা না এলে এতদিনে বাঙালি হিন্দুর পৃথক অস্তিত্ব থাকত কিনা তা সন্দেহ।

এই 'বঙ্গাল খেদায়' ভীত হয় তৎকালীন অসমের অন্যান্য ভাষাভাষী জাতি উপজাতিরা। সংখ্যায় বাঙালির থেকে অনেক কম হলেও বাঙালি হিন্দুর মতন নরম বা কাপুরুষ তারা নয়। তাই বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে সম্প্রসারণবাদী হুজুক তোলা অসমীয়া সমাজ দেখল মাত্র এক দশকে বিশাল অসম ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নাগা, মিজো, খাসি, গারো কেউই অসমে থাকতে রাজি হল না। এক দশকের মধ্যেই নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় আলাদা রাজ্য হয়ে গেল। ব্রহ্মপুত্র নদের দুইপাশে এক করিডোরসম মানচিত্র হল

খণ্ডিত অসমের। সেই করিডোরের পশ্চিমে পশ্চিমবাংলা সংলগ্ন প্রায় শতকরা একশভাগ বাঙালীভাষী ধুবরী বা দক্ষিণ-পূর্বে ত্রিপুরা সংলগ্ন কাছাড় অসম থেকে আলাদা হওয়ার কথা বাঙালি মিন মিন করে বলারও সাহস করে উঠতে পারলো না।

বাংলাদেশী ও অসম

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হল। ভারতীয় হস্তক্ষেপে মাত্র নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হল। (মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশে এখনও হট টপিক। একটি খ্যাতনামা দৈনিকে রোজ মুক্তিযোদ্ধাদের কাহিনী প্রকাশিত হয়, কয়েক'শ বই প্রকাশিত, বইমেলায় বিশেষ স্টল, অনেক গল্প লেখা হয়েছে - কিন্তু সবাই নীরব ভারতের কয়েক হাজার সৈনিকের জীবনদান ও ভারতের সাহায্যের ব্যাপারে। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ভারতের এই মুখ্য ভূমিকার কথা জানেই না।) নতুন বাঙালির জন্ম হল এবং শুরু হল অনুপ্রবেশ। এবার আমরা অসমের জনসংখ্যার সংখ্যাতত্ব একটু দেখে নিতে পারি। এই জনসংখ্যা বর্তমান অসমের জেলাগুলি নিয়েই তৈরী - পুরানো অসমের নয়।

সারনী ও রেখচিত্র দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে ১৯০১ থেকে ৪০ বছরে ১৯৪১-এ অসমের মুসলমানদের সংখ্যা ১৫% থেকে বেড়ে ২৫% ছাড়িয়েছে যা নিশ্চয়ই যে কোন জায়গার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্নের। এই বৃদ্ধি যে শুধু জন্মহারের জন্য বৃদ্ধি নয় তা বোঝা যাবে যে ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ - এই ২০ বছরে কোন বৃদ্ধি নেই। আবার ১৯৭১ থেকে ২০১১ এই ৪০ বছরে আবার মুসলমান সংখ্যা প্রায় ১০% বেড়ে ৩৪%-র কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ অসমের জনমানচিত্রে একটি ভয়ংকর পরিবর্তন এনেছে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি। এই জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ

যে একটি মূল কারণ তা সবাই জানেন।

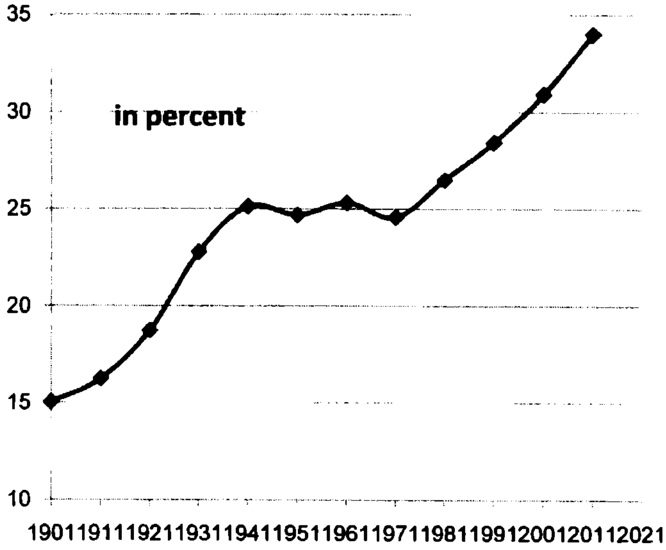
এত হৈ চৈ, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ, উপজাতি অস্মিতা, অসমীয়া-বাংলা-বড়ো ভাষা দ্বন্দ, হিন্দুত্ববাদ ইত্যাদি ইত্যাদি সোরগোলের মধ্যে নীরবে অসমে নিজেদের সংখ্যা ক্রমশ: বাড়িয়ে চলেছেন অসমের মুসলমানরা, হিন্দুদের সংখ্যা কমে দাড়িয়েছে ৬২% এর আশেপাশে। এই ৬২ শতাংশ থেকে অন-অসমীয়া হিন্দুদের সংখ্যা বাদ দিলে অসমে অসমীয়ার সংখ্যা ৪০ শতাংশেরও কম হবে।

কাশ্মীরের পর অসম হল ভারতের সর্বোচ্চ মুসলিম প্রধান প্রদেশ। এদের ৯৫ শতাংশ বাংলাভাষী, যদিও কোন কোন জনগণনায় এরা নিজেদের অসমীয়া ভাষী বলে পরিচয় দিয়েছেন। ২০০১ সালের জনগণনায় ৭টি জেলায় অসমিয়াভাষীদের মোট সংখ্যাটিই কমে গেছে যা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। যেমন উদাহরণ স্বরূপ দরং জেলাকে ধরা যাক। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের জনগণনায় তুলনা করে দেখা গেছে এই দশ বছরে অসমীয়াভাষীর সংখ্যা ৮,৬৯,৪৭৭ থেকে কমে হয়েছে ৫,৮৯,০০৬। অন্য দিকে বাংলাভাষীর সংখ্যা ১,৮২,০০৭ থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ৪,৬২,৬৭৬। খুব সোজা অঙ্কে বলা যায় তিন লক্ষ মানুষ যারা ১৯৯১ সালে নিজেদের অসমীয়াভাষী বলেছেন, দশ বছর বাদে তারা নিজেদের পরিচয় বদলে ফেলেছেন। কিন্তু যে পরিচয়টা কখনো বদলায় নি সেটা হল ধর্মের। অসমীয়াভাষী বা বাংলাভাষীর সংখ্যা ওঠা নামা করলেও ধর্মীয় পরিচয়ের সংখ্যার কাঁটা উপরের দিকেই উঠেছে।

বর্ষ	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
মুসলমান %	১৫.০৩	১৬.২৩	১৮.৭৪	২২.৭৮	২৫.১৩	২৪.৬৮
বর্ষ	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১*	১৯৯১	২০০১	২০১১**
মুসলমান %	২৫.৩	২৪.৫৬	২৬.৪৯	২৮.৪৩	৩০.৯১	৩৪

* এটি ১৯৭১ ও ১৯৯১-র গড়। ১৯৮১তে আসামে জনগণনা হয় নি।

** সম্ভাব্য। ২০১১-র জনগণনার ধর্মভিত্তিক তথ্য এখনো প্রকাশিত হয় নি।



এজন্যই আশির দশকে শুরু হল দ্বিতীয় 'বঙ্গাল খেদা'। স্কুল-কলেজ, সাইনবোর্ড, সিনেমা হল, যাত্রাপালা থেকে বাংলা ও সরকারী বেসরকারী চাকরি থেকে বাঙালি হিন্দু হঠিয়ে বলীয়ান অসমীয়া সমাজ এবার দাবি তুললো 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' বিতাড়ণের। অর্থাৎ মুসলমান হঠাও। এবার কিন্তু ব্যাপারটা আগেরবারের মতন সহজ রইলো না। যত হম্বি তম্বি সব সরকারী অফিস ও তৈল শোধনাগার ঘেরাও আর লাগাতার বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো। গুয়াহাটি শহরে কিছু বাঙালি হিন্দুকে রাস্তায় ঘাটে হেনস্থা করার বেশি কিছু হিম্মত তাদের হল না। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলিমদের হটানোর দায়িত্ব তারা সরকারের ওপর ছেড়ে দিলেন। এবং তারা (আন্দোলনকারীরা, আসু) সরকারে এলে কড়া কদম নেবেন বলে আওয়াজ তুললেন।

এখানে বলে রাখা ভাল ওই আন্দোলনের সময় ঘটা 'নেলী হত্যাকান্ডের' সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কোন যোগ নেই। ওই ঘটনা ঘটিয়েছিল অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের ওপর অসন্তুষ্ট একটি উপজাতি (টিওয়া)। অসমীয়া হিন্দুর মুসলমানের ওপর চড়াও হওয়ার অত সাহস নেই।

রাজীব গান্ধীর সঙ্গে চুক্তি করে ক্ষমতায় এলেন আন্দোলনকারীরা (আসু/অগপ), কিন্তু কোন বাংলাদেশীর গায়ে হাত পড়ল না, তাদের তাড়ানো হল না। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ কোন গপ্পো নয়, ১৯৮৫ সালের ঐতিহাসিক আসাম চুক্তির অন্যতম বিষয় ছিল ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষদের বিতাড়িত করতে হবে। মন্ত্রী হয়ে আন্দোলনকারী নেতারা কোটিপতি হলেন এবং রাজধানী গুয়াহাটিতে একটি আইআইটি প্রতিষ্ঠা হল। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। অনুপ্রবেশকারী হিসেবে 'ডি' ভোটারের তালিকায় উঠল পূর্বপাকিস্তানে মানসম্মান, জমিজিরেত হারিয়ে আসা বেশ কিছু

হিন্দু ভোটারের নাম।

আসু থেকে বেরিয়ে আসা জঙ্গি গ্রুপ আলফা আন্দোলনের দিশা পাল্টে দিল। তাদের মূল শত্রু অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নয়, অন-অসমীয়া ভারতীয় নাগরিকরা। তাদের প্রধান কাজ বিহারী শ্রমিক হত্যা আর মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের থেকে মোটা চাঁদা আদায় করা। আসুর ভারত বিরোধিতা আইএসআই এর পছন্দ হল খুব। বাংলাদেশে বেগম জিয়ার আশ্রয়ে এবং আইএসআই এর পয়সায় আলফা চালাতে থাকল শিশুহত্যা সহ অন্যান্য সন্ত্রাসমূলক কাজ। ইসলামী মৌলবাদীদের সঙ্গে তৈরী হল আশ্চর্য গাটছড়া।

বোড়োল্যান্ড থেকে প্যারিস

আসুর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে শুরু হল অসমীয়া জাতীয়তাবাদ বিরোধী এক নতুন আন্দোলন। আগে অসম থেকে বেরিয়ে যাওয়া উপজাতিরা ছিল পার্বত্য অঞ্চলের, এবার সমতলের উপজাতিরাও দাবী জানাল অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় উপজাতি হল বোড়ো উপজাতি। এদের আছে অসমীয়া থেকে সম্পুর্ন আলাদা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। ধর্মে প্রধানত: হিন্দু হলেও দশ শতাংশ খ্রিস্টান এবং কিছু ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। এবার দাবী ওঠল 'ফিফটি ফিফটি' - অসম ভাগ হোক আধাআধি। ব্রহ্মপুত্রর উত্তর ভাগ সমতলের উপজাতিদের (প্লেইন ট্রাইবালস) আর দক্ষিণ অসমীয়ার। এই আন্দোলনের অগ্রণী বোড়ো-রা হাতে তুলে নিল বন্দুক। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে অসমের আটটি জেলার (কোকরাঝার, ধুবরী, বঙ্গাইগাঁও, বরপেটা, নলবারী, কামরূপ, দারাং, সোনিতপুর) কিছু কিছু অংশ নিয়ে সৃষ্টি হল বিটিএডি (Bodoland Territorial Area Districts)।

কিন্তু যতই বোড়ো আন্দোলন, বোড়োল্যান্ড হোক, মুসলমানরা

বোড়োল্যান্ড, আসাম বা পশ্চিমবঙ্গে তাদের জনসংখ্যা বাড়িয়েই চলেছেন। এই নিঃশব্দ অভিযান উত্তরপূর্ব ভারত, পশ্চিমবঙ্গে চলবেই কারণ এই অঞ্চলের কোন প্রধান দল (কংগ্রেস, অগপ, তৃণমূল, সিপিএম, নক্সাল-মাওবাদী) এর বিরোধিতা করতে রাজী নয়। বোড়োল্যান্ডের বাঙালি মুসলমানরা কত শতাংশ বাংলাদেশী আর কত শতাংশ ভারতীয় এ প্রশ্ন এখন অর্থহীন। এই সাম্প্রতিক দাঙ্গায় মুসলমানরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কারণ বোড়ো একটি গোষ্ঠির হাতে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের এই সাম্প্রতিক ক্ষতিতে বোড়োদের তেমন লাভ হবে না কারণ ক্রমবর্ধমান মুসলমানদের বোড়োভূমিতে বসবাস বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না। আর মুসলমান বসবাস মানে শুধু জমি আর অর্থনীতির ব্যাপার নয়, সংস্কৃতি জীবনচর্যার ব্যাপারও বটে। বড়ো-মুসলিম সংঘাত কোন বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমস্যা নয়। ঠিক এই জাতীয় সংঘাত ঘটে চলেছে মায়ানমারে, থাইল্যান্ডে, ইজিপ্টে, লন্ডনে, বার্মিংহামে, প্যারিসে, জার্মানিতে। সর্বক্ষেত্রেই সংঘাতে একটি সাধারণ পক্ষ বিদ্যমান - ইসলাম।

বোড়োল্যান্ড একট ফুলকি মাত্র, আগুনে পুড়বার অপেক্ষায় সমগ্র আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপূর্ব ভারত। যেমন পূর্বপাকিস্তান/ বাংলাদেশের ২৯% হিন্দু এখন ৮%-এ নেমে এসেছে, একদা ৮৫% খ্রিস্টান অধ্যুষিত লেবানন এখন মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ, উপযুক্ত সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা না নিলে বোড়োল্যান্ডের বোড়োদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। সুতরাং আরো অশান্তির জন্য অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

(দেশকাল ভাবনা - ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২)

আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান বাঙালির ছবি আঁকছে কলম

৫ এপ্রিল, ২০১২ শুরু কলম দৈনিক পত্রিকা। একেবারে শীর্ষে প্রতিদিন নামাযের সময়সূচী। এই দৈনিক পত্রিকা মুসলমানদের জন্য। ১৪ই জুলাই, ২০১২ তে কলম পত্রিকার ১০০তম সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার প্রবন্ধের প্রথম বাক্যগুলি হল -'দৈনিক কলম-এর পথ চলার আজ ১০০ দিন। বলা যায় দৈনিক কলম-এর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে স্বপ্নপূরণ হল ভারতের বাংলাভাষী মুসলমানদের। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরার বাঙালি মুসলমানরা অর্ধশতকেরও বেশী সময় ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছে একটি বাংলা দৈনিকের।' লিখেছেন আহমদ হাসান (ইমরান)। কথাগু লি গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ দেশভাগের পর স্বাধীন ভারতের শুরুতেই মুসলমানদের এরকম একটা পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের ব্যাপ্তি শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় অসম, ত্রিপুরাতেও।

এই ইসলামি কাগজের সম্পাদক একজন বর্ণহিন্দু, সুদীপ্ত সেন। এর প্রকাশক একটি জমি ব্যবসায়ী হিন্দু নিয়ন্ত্রিত সংগঠন সারদা গ্রুপ। এই প্রকাশনার সার্বিক কর্ণধার আরেকজন বর্ণহিন্দু তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ কুণাল ঘোষ, এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী। অর্থাৎ বাঙালি হিন্দুই এতদিন পর বাঙালি মুসলমানের এই আর্তি বুঝতে পেরেছে। এজন্য এই কাগজের আষ্ঠেপৃষ্ঠে মমতা-বন্দনার ছড়াছড়ি।

কলম কাগজের আসল বা কার্যকরী সম্পাদক আহমদ হাসান (ইমরান)। কলম বেশ কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত একটি ইসলামি সাময়িকী। এটি ইসলামের চিন্তাধারায় রাজনীতি-শিল্প-সাহিত্যচর্চার

সাময়িকী। এরকম সাময়িকী অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীরও আছে। আর এস এসের মুখপত্র স্বস্তিকাও এরকম একটি সাময়িকী। কিন্তু শাসক দলের সাহায্যে, শিল্পপতি গোষ্ঠীর সরাসরি আর্থিক আনুকুল্যে একটি ধর্মীয় সাময়িকীর পূর্ণাঙ্গ দৈনিকে উন্নয়ন একটি বিরাট পরিবর্তন। কলম-কে একটি পূর্ণাঙ্গ দৈনিকে উন্নীত করে তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠরা এই পরিবর্তন ঘটালেন। এই পত্রিকার তৃণমূল সরকারের এতই আশীর্বাদ-ধন্য যে এই পত্রিকার কোন সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই তা সমস্ত সরকারি গ্রন্থাগারের পাঠ্যসূচীর মধ্যে আবশ্যিক বলে অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায়।

হিন্দু সম্পাদকের বকলমে ইসলামি পত্রিকা যে আদর্শ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের সামনে রাখবে তা প্রথম দিন থেকেই খুব পরিষ্কার। ফলে 'কলম'-এর প্রকাশে ৪র্থ দিনেই (৮ এপ্রিল ২০১২) তার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের মন নিয়ে প্রবন্ধ রয়েছে। কিন্তু তা কিরকম হতে হবে তার স্পষ্ট দিশা রয়েছে সেই দিনের পত্রিকার পরের পৃষ্ঠাতেই। তাতে সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের হিট তুর্কি চলচ্চিত্রকে ইসলামি সিনেমার আদর্শ বলে ডগমগ বর্ণনা রয়েছে। এই ছবি মুসলমানদের হাতে কনস্ট্যান্টিপোলের পতন ও ওসমানি সাম্রাজ্যের পত্তনের কাহিনী। 'কলম' লিখছে 'তুরস্কের উগ্র-ধর্মনিরপেক্ষতার কাটখোট্টা জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে বর্তমানের 'নব্য ওসমানিয়' তুর্কী প্রজন্ম যদি পাশ্চাত্যের প্রজেক্ট করা কামালের বদলে আরবের বিজয়ী বীর মাহমুদকে আরও একবার জাতীয় নেতা মেনে নিতে চায় তবে ক্ষতি কি?'। ফলে কলম কাগজে নজরুল ভজনা থাকলেও নজরুলের 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই' ভুলে যেতে হবে - নতুন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের আদর্শ মধ্যযুগের আরব বীরেরা।

শুরুতেই এটাও বলে রাখা উচিত যে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রে যে মান সে অনুসারে 'কলম' একটি ভাল মানের পত্রিকা। আর্ন্তজাতিক, দেশীয়, প্রতিবেশী দেশ, প্রতিবেশী রাজ্য ও জেলার সংবাদ নিয়ে যে

বিস্তৃত খবর ‘কলমমঞ্চ-এ থাকে তা বাংলা অন্যান্য কাগজে বিশেষ থাকে না। বাংলা বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলিতে আর্ন্তজাতিক খবর, বাংলাদেশের খবর, আসামের খবর থাকেই না। বাঙালি হিন্দু কলকাতাকেন্দ্রিক কেচ্ছা নিয়েই মশগুল থাকে। কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে দেগঙ্গায় ৩ দিন ধরে ইসলামি আক্রমণে হিন্দু ঘরবাড়ি-মন্দির-দোকানপাট লুঠ হতে থাকলেও কলকাতার বাংলা সংবাদপত্রের তাতে কিছু যায় আসে না। এই লেখার সময়ে আসামের বরাক উপত্যকায় একজন বিধানসভার সদস্য বাঙালি হিন্দু মহিলার বেআইনি ইসলামে ধর্মান্তরকরণ নিয়ে দাঙ্গা চলেছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রে তার কোন খবর নেই। বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলে, নির্বাচনের পরে কয়েক লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে বিতাড়িত হলে, বরিশালের ভোলায় কয়েক’শ হিন্দু নারী ধর্ষিতা হলে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রে তা কোন স্থান পায় না, পাবেও না। এই অজ্ঞতার সুযোগে নিজেকে বরিশালী বলে গর্ব করা ঐতিহাসিক বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িকতার গুণগানে রত থাকেন। আর আর্ন্তজাতিক খবর তো নামমাত্র। কলকাতার সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় নিজস্ব গোষ্ঠীর কিছু লেখকের লেখাই প্রকাশিত হয়। হিন্দি দৈনিক পত্রিকায় ইংরেজী পত্রিকা থেকে খ্যাতনামা লেখকদের প্রবন্ধ অনুবাদ করে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কলম পত্রিকা বাংলাদেশের ইসলামি পত্রিকা থেকে গু রুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকে। ফলে যদি কেউ দ্বিতীয় একটি বাংলা সংবাদপত্র রাখতে মনস্থ করেন তবে তাকে ‘কলম’ রাখতেই পরামর্শ দেব কারণ তাতে পশ্চিমবঙ্গের চেপে রাখা বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবে। ‘কলম’ কাগজটি কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সংবাদপত্রের এই কূপমন্ডুকতাকে ভেঙে তাকে এক বড় পৃথিবীতে হাজির করেছে। কিন্তু কেমন সেই দুনিয়া? আর কলমের রাজ্য বা প্রতিবেশীদের অঙ্গনটি কেমন?

কলম-এর পৃথিবী এক অন্য পৃথিবী - সেজন্য তার আর্ন্তজাতিক খবরের পৃষ্ঠার নাম - বিশ্ব জাহান। অর্থাৎ শুধু বিশ্ব কথাতে কুলালো না, সাথে জাহান-কে নিতে হল। মনে রাখতে হবে ইসলামের একটি প্রধান ধারণা হচ্ছে ইসলামি পৃথিবীর যার ইসলামি নাম উম্মা। ইসলামে পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করা রয়েছে, দার-উল-হরব আর দার-উল-ইসলাম। প্রথমটির অর্থ যুদ্ধের দেশ ও অন্যটি ইসলামের দেশ। এই কথাগুলি সাধারণ মুসলমানের কাছে পরিচিত শব্দ। দার-উল-ইসলাম-এর বর্তমান অভিব্যক্তি হল Organisation of Islamic Countries। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের এরকম আর্ন্তজাতিক সংগঠনের দরকার হয় না, কিন্তু ইসলামের হয়। এতে কেবলমাত্র সে সব দেশই অর্ন্তভুক্ত যেখানে মুসলমানরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছে অর্থাৎ দার-উল-ইসলাম। বাকিরা, ভারত তার মধ্যে পড়ে, দার-উল-হারব, যেখানে মুসলমানেরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে। যে কোন যুদ্ধের একটাই মূল লক্ষ্য -- জয়ী হওয়া, ফলে এইসব দার-উল-হরবকে যুদ্ধে হারিয়ে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা একটি পবিত্র ধর্মীয় লক্ষ্য। এই চিন্তাতেই রোজ সকালে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান বিশ্ব জাহানে পড়েন হয় ইরান ইরাক তুরস্ক ইত্যাদি দার-উল-ইসলামের খবর অথবা দার-উল-হরব আমেরিকা ইউরোপে মুসলমানদের বিভিন্ন সংগ্রামের খবর। মিশরে ইসলামপন্থীদের জয় কলম কাগজে দারূণ সাড়া ফেলেছে। যেহেতু 'কলম' কাগজটি দার-উল-হরব পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত তাই কিছু সতর্কতা থাকেই, তালিবানের সমালোচনা না থাকলেও তার প্রশংসা করা হয় না। যেমন লন্ডনের গড় মুসলমানকে যদি লন্ডনে বাস-ট্রেনে ইসলামি সন্ত্রাসবাদী গণহত্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তবে তারা প্রথমে বলবেন এসব তারা সমর্থন করেন না কিন্তু এর জন্য যে আসলে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতিই দায়ী -- এই বলে ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের এই গণহত্যার দায় থেকে অনেকটাই মুক্ত করবেন। বিশ্বজুড়ে ইসলামি মতবাদ যে নতজানু

পশ্চিম মেনে নিচ্ছে তার খবর থাকে অনেক। যেমন অনেকটা জায়গা জুড়ে সৌদি আরবের মেয়ে ফুটবলাররা মাথা কাপড়ে ঢেকে পা পর্যন্ত ট্র্যাকসুট পরে আর্ন্তজাতিক খেলায় অংশগ্রহণের অনুমতি পেয়েছে তার ছবি বা নয়া তুরস্কের ইসলামি প্রধানমন্ত্রী এরদোগান গর্ভপাতকে খুনের সমান বলেছেন ও তুরস্কে গর্ভপাতের সেকুলার আইন যে অচিরেই নিষিদ্ধ করা হবে তার বিশদ খবর।

বাংলাদেশ ও আসামের জন্য নিয়মিত একটি পাতা বরাদ্দ কলম-এ। আসাম ত্রিপুরার বিপুল বাংলাভাষী মুসলমানের জন্য এর প্রয়োজনের কথা কলম-এ আগেই বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ বাংলাভাষী মুসলমানরাই আসামের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠি। দেড় দশক আগেও বাংলাদেশে 'লেবেনস্রম' (Lebensraum) কথাটা বেশ প্রচলিত ছিল। এটি একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ বাসভূমি। ইউরোপে জার্মান সম্প্রসারণের জন্য অন্য দেশের জার্মানভাষী অঞ্চলকে জার্মানিতে অর্ন্তভুক্ত করার দাবী। বাংলাদেশের মুসলমান মৌলবাদীদের (ও কিছু জাতীয়তাবাদী) দাবী ছিল যে আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ পুরোটাই মুসলমান বাঙালির স্বদেশ -- যেখানে তারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। এই পুরো অঞ্চলকেই বাঙালি মুসলমানের বাসভূমি বলে গণ্য করতে হবে ও যাতায়াত ও বসবাসের অধিকার দিতে হবে। একটি বৃহৎ বাংলাদেশ গঠনের দাবী এখনও রয়েছে। এখন অবশ্য ব্যাপক বেআইনি অনুপ্রবেশ ও স্থানীয় সরকারগুলির এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকার সুবাদে একধরণের 'লেবেনস্রম' চালু হয়ে যাওয়াতে এই শ্লোগানটি বিশেষ শোনা যায় না। আসামের পাশাপাশি থাকে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের খবরে সেদেশের মৌলবাদী সাফল্যের খবর গুরুত্ব পায়। সম্প্রতি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের নার্সদের একাংশ হিজাব (মাথা ও মুখের অনেকটা ঢেকে) পরে কাজ করার জন্য আন্দোলন করে। প্রথমে কর্ত্তৃপক্ষ তা না মানলেও পরে মৌলবাদী চাপে মানতে বাধ্য হয়। সেই ইসলামি হিজাব পরে নার্সদের

জয়ের ছবি ছেপেছে কলম। শুধু ভারত নয় বাংলাভাষী মুসলমানের পুরো অঞ্চলটাই রয়েছে কলম-এর নজরে।

রাজ্যের খবরের জন্য একটি পাতার নাম সুবে বাংলা। নামটি গুরুত্বপূর্ণ। এটির সঙ্গে যোগ রয়েছে প্রায় ছশো বছরের বাংলায় ইসলামি শাসনের স্মৃতির। এর মধ্যে আগামী দিনে বিহার ওড়িশার অঞ্চলও ঢুকতে পারে। বাংলাদেশে বেশ সাড়ম্বরে ২৩শে জুন পলাশী দিবস পালিত হচ্ছে যেদিন নাকি পলাশীর প্রান্তরে বাঙালী স্বাধীনতা হারায়। কলম-এর সুবে বাংলায় বাঙালি মুসলমানকে সেই ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে দেবার প্রচেষ্টা কিনা তা ভবিষ্যত বলবে। এছাড়া নিয়মিত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলমান ব্যক্তিত্বের পরিচয় থাকে, এদের মধ্যে মধ্যযুগীয় অবাঙালি মুসলমান শাসকদেরও বাঙালির ঐতিহ্য বলে পরিচিত করানো হয়। একটি প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের মুসলমান লেখকদের অর্ন্তভুক্ত করার দাবীও জানান হয়েছে। এছাড়া রাজ্য জুড়ে তবলিগি জামাত ও বিভিন্ন ইসলামি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের খবর নিয়মিত পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের অন্য দৈনিক সংবাদপত্রদের একটি জায়গায় হারিয়ে দিয়েছে কলম। পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন সংবাদপত্রে কোন ধর্মের জন্য সাপ্তাহিক সাময়িকী প্রকাশিত হয় না। কোন ধর্মনিরপেক্ষতার ভড়ং না রেখে প্রতি শুক্রবার কলম-এর থাকে বিশেষ রঙিন ক্রোড়পত্র দ্বীন দুনিয়া। কফি হাউসের হিন্দু বুদ্ধিজীবিরা দ্বীন কথাটা কোনদিন শোনেনেই নি, যেমন জানেন না কাকে বলে গনিমতের মাল (জেনে নিন, আপনাদেরই ভাল হবে)। ইসলামের আরেক নাম দ্বীন, ফলে এতে থাকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইসলামের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা। ইসলাম একটি ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক মতবাদ ফলে এই আলোচনায় আধাত্মিক ব্যাপারের বাইরে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও গুরুত্ব পায়।

এবার ভাবা যাক এই কাগজ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান বাঙালির কি পরিচয় (আইডেনটিটি) তৈরি করবে? বলে রাখা ভাল কলমের দৈনিক হবার ভিত্তি তৈরী করেছিল কমুনিস্ট নেতৃত্বের বামফ্রন্ট। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান বাঙালিকে পুরোপুরি মুসলমান হবার ব্যবস্থা করেছিলেন তারাই। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে কোন আধুনিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে প্রচার করবার কোন প্রচেষ্টাই নেন নি তারা। হিন্দু মৌলবাদের জুজু দেখিয়ে তারা চিরকাল মুসলিম মৌলবাদের সাথে হাত মিলিয়ে চলেছেন, কেরালা তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বামপন্থী কেরালা তাই মুসলিম মৌলবাদের শক্ত ঘাঁটি। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদী মাদ্রাসা শিক্ষার পুনর্জীবন ঘটে বামফ্রন্টের হাতে, একে তাদের সাফল্য বলে সবকটি নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা আছে। বাঙালির ইতিহাস-সংস্কৃতিতে মুসলমান নিয়ে কোন ভিন্নমতের চর্চাকে নির্বাসন দিয়ে, মুসলমান সমাজ থেকে উঠে আসা বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে সাহায্য না করে নিজেদের সেকুলার ভেবে এক কল্পিত আনন্দধামে বাস করছেন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবিরা। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্য দূরীকরণে বামফ্রন্টের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়।

২১ নভেম্বর ২০০৭-এ পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ মুসলিম রাজনীতির দিক নির্ধারণ হয়ে যায়। সেদিন মুসলিম মৌলবাদকে তোষণ করতে সিপিআইএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়ানো হল তসলিমা নাসরিনকে। ২০১০ থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার দরজার সামনে পৌঁছে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটের দাম তখন সবচেয়ে বেশী। মমতা বন্দোপাধ্যায় এবার মুসলিম মৌলবাদ তোষণে বামফ্রন্টকে অনেক ধাপ পিছনে ফেলে দিলেন। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সভার মঞ্চে ধর্মীয় নেতারা অর্থাৎ ইমামরা হাজির হলেন -- তৃণমূল

কংগ্রেসের মঞ্চে। ২০১১-তে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ গরীব মুসলমানদের অর্থনৈতিক সাহায্যের তেমন বড় কোন চমক নেই, চমক আছে সমগ্র মুসলমান সমাজকে ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসা-র কাছে জিম্মি রাখতে। এই ইমাম ভাতা, মুয়াজ্জিন ভাতা, মাদ্রাসা রাজনীতির বিরুদ্ধে সিপিআইএম বা বামফ্রন্ট বা আগমার্কা কমুনিস্ট এসইউসিআই কেউ টুঁ শব্দ করে নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু চমকের রাজনীতি করেন তাই তিনি সাহস করে মুসলমান সংশ্লিষ্ট যে কোন অনুষ্ঠানে গিয়েই মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেন - এক কথায় বাঙালি মুসলমান সমাজকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ভোট ব্যাঙ্ক নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিলেন। জ্যোতি বসু বা বুদ্ধ ভটচায মাথায় মুসলমানি টুপি পরে নেবার মত স্মার্ট হতে পারেন নি, এটুকুই তফাত।

কলম কাগজের উদ্দেশ্য যে একটি ইসলামি মৌলবাদি বাঙালি মুসলমানের পরিচয় তৈরি করা তা কোনমতেই কলম লুকিয়ে রাখতে চায় নি। একে মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় শোধন করার দায়িত্ব সিপিএম, এস ইউ সি বা নকশালদের ও কিছু বুদ্ধিজীবিদের। কিন্তু কলম-এর সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বড় অবদান থাকবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কে কোন সরকারি অফিসে কাপড়ে মাথা ঢেকে মহিলাদের যাওয়া বারণ ছিল, তুরস্কে-ই ইসলামি তুর্কি টুপি নিশ্চিহ্ন করেছিলেন কামাল আতাতুরক। সাম্প্রতিক নির্বাচনে জিতে ইসলামপন্থি প্রেসিডেন্টের স্ত্রী মাথায় কাপড় ঢেকে জানিয়ে দিয়েছেন যে দেশ আবার মধ্যযুগে ফিরে যাবে। এই কাজটি পশ্চিমবঙ্গে করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলম কাগজে এবার পরীক্ষায় কৃতী মুসলমান ছাত্রীদের ছবি ছাপা হয়েছে তারা সবাই মাথা কাপড়ে ঢেকেছে। মমতা-পন্থি বিশিষ্টজনেরা, বিভাস চক্রবর্তী, শাঁওলি মিত্র থেকে যোগেন চৌধুরীরাও মুসলমান নারীদের প্রতি এই অন্যায়ের ভাগীদার হয়ে

থাকলেন।

কলম -কাগজের বাঙালি মুসলমান পরিচিতির একটি বড় সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের অস্তিত্ব। ভারতীয় মুসলমান বাঙালির পরিচয় আর বাংলাদেশের মুসলমানের বাঙালির পরিচয়ের মধ্যে সম্পর্কটি কি হবে - তা ইসলামি মননে একটি নতুন সমস্যা। বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রয়াত জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের নাগরিকদের বাংলাদেশী বলে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বর্ণনা করে এবং তা সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করে একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা ফিরে এসে আবার বাঙালি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ফিরিয়ে এনেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কাগজে বাঙালি বলতে বোঝাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, বাংলাদেশের কাগজে তা বোঝাবে বাংলাদেশের বাঙালি। মূলতঃ এখনো যা হবে হিন্দু বা মুসলমান। কিন্তু বাংলাদেশ আলাদা স্বাধীন দেশ, মুসলমান দেশ ও বিপুল জনসংখ্যা হওয়ার সুবাদে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে এখন পরিচিত। এই নতুন বাঙালি কে হবে, তাতে ইসলামের কোন ভূমিকা থাকবে কিনা এসব নিয়ে বাংলাদেশে উচ্চমানের চর্চা চলছে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী জামায়েত নেতাদেরও এখন পুরো বাঙালি সাজতে হচ্ছে কারণ তা না হলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে টিকে থাকা মুশকিল। সুতরাং এক নতুন বাঙালির সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছে যে বাঙালি জাতি ইসলামের অবদান। ইসলামি শাসকরাই বাঙালি জাতি তৈরি করেছে, এই বাঙালির হিরো সিরাজদ্দৌল্লা থেকে তার আগের মুসলমান শাসকরা, বাঙলা ভাষাও তারাই তৈরি করেছে মাঝে দু'শ বছর ইংরেজদের চক্রান্তে বর্ণ হিন্দুরা (নাম না করে বিদ্যাসাগরের মতন হিন্দু পন্ডিতেরা) তা দখল করে নিয়েছিল। এ সংক্রান্ত একটি সুলিখিত প্রবন্ধ বাংলাদেশের ইসলামি দৈনিক 'নয়া দিগন্ত' থেকে পরের দিনই প্রকাশ করে কলম। সিরাজদ্দৌল্লার পর

এখন পুরো বাংলা, সুবে বাংলার, রাজত্বের অধিকার মুসলমানদেরই।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোট একটি ক্রান্তিক বা ক্রিটিক্যাল ভরে পৌঁছে গেছে, যা ঠিকমত ব্যবহার করলে নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জুয়াই খেলছেন। এই ভোটকে এক জায়গায় ধরে রাখার জন্য মুসলমান সমাজের নিয়ন্ত্রণের তালা ও চাবিটি তুলে দিয়েছেন মৌলবাদী ধর্মীয় নেতাদের উপর। এই ভোট পাবার জন্য বামফ্রন্ট আরো মৌলবাদী যে হবে না তা কে বলতে পারে? এছাড়া নন্দীগ্রাম আন্দোলনের স্রষ্টা জামায়েত উলেমার সিদ্দিকুল্লা সাহেব এখন আসামের মুসলমানদের দল মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আগামী নির্বাচনে কেরালার মতন পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লীগের মতন একটি পুরো মুসলামান দলও পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কেরলের একটি অতি বৃহৎ গুণগত পার্থক্য রয়েছে। কেরালা দ্বিখন্ডিত হয় নি, কেরালার ঘাড়ের উপর আরেক কেরালার অস্তিত্ব নেই। আর দশক দুয়েক পরে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনমানচিত্রের বদল হয়ে মুসলমান ভোট প্রায় সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে আর কলম-এর চিন্তাধারায় বলীয়ান মুসলমান সমাজ পশ্চিমবঙ্গের কি রূপ দেবে তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে একটি পরিণতি এই হতে পারে যে সুদীপ্ত সেন কুণাল ঘোষের আত্মীয়স্বজনদের পাটনা বা ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনে ঠাঁই নিতে হতে পারে যেমন ছয় দশক আগে আমাদের বাবা-মা বা দাদু-ঠাকুমাদের এসে দাঁড়াতে হয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশনে।

(দেশকাল ভাবনা - ২০ জুলাই, ২০১২)

সংখ্যালঘু ও পশ্চিমবঙ্গের অনিশ্চিত ধর্মনিরপেক্ষ ভবিষ্যৎ

শিরোনামটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় একেবারেই অচ্ছুৎ জেনেও সরাসরি সমস্যার পরিচয়ে যাওয়ার জন্য এই উসকানি। না বললেও চলে যে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু বলতে মুসলমান জনগোষ্ঠীকেই বোঝায়, ও তার চাপে অন্যান্য ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের এখানে কোন সংখ্যালঘু পরিচয় গড়েই ওঠেনি। অর্থাৎ সাঁওতাল সংখ্যালঘু বা নেপালি সংখ্যালঘু কথাটি বাংলায় অচল। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যালঘু মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, সবচেয়ে বড় সমস্যা যে এই জনগোষ্ঠীর বৃহদংশ প্রবল দারিদ্রের মধ্যে রয়েছেন এবং তার সঙ্গে এই জনগোষ্ঠী দিনে দিনে ধর্মীয় সংকীর্ণতায় নিমজ্জিত হচ্ছেন। এই নিবন্ধ সংখ্যালঘু মুসলমানদের এই সমস্যার আলোচনায় যাবে না যদিও তা অবশ্যই জরুরী। তবে এই সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এই নিবন্ধ প্রশ্ন করবে যে এই সংখ্যালঘু মুসলমান জনগোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজের জন্য একটি সমস্যা হয়ে উঠছে কিনা এবং কেন।

১

বিশেষ সংখ্যালঘু?

যদি প্রশ্ন করা হয় পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে সত্যিই সংখ্যালঘুর বিশেষ মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা তবে হয়ত লেখকের পাটিগণিতের জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে। কিন্তু এটা বোঝা উচিত যে সংখ্যায় কম হলেই তাকে সংখ্যালঘুর বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় না।

জনসমাজে চোর, ডাকাত বা ব্রাহ্মণরাও সংখ্যায় কম কিন্তু তা বলে তাদের সংখ্যালঘু বলা হয় না, পাড়ার মাস্তানকে আমরা সংখ্যালঘুর মর্যাদা দিই না। অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গরা, ইরাকে সুন্নি মুসলিমরা বা ভারতের একটা বড় অংশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়েও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তখন তাঁদের আমরা সংখ্যালঘুর মর্যাদা দিই না। সুতরাং জনসমাজে সেই অংশকেই সংখ্যালঘুর মর্যাদা দেওয়া হয় যারা সংখ্যায় কম হওয়ার ফলে সমাজ বা রাষ্ট্র দ্বারা দীর্ঘদিন নিপীড়িত, সে নিপীড়ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা ভাষাগত হতে পারে।

১৯৪০ সালে, দেশভাগ হবার অনেক বছর আগে বাবাসাহেব আম্বেদকার পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনায় বলেছিলেন 'দু দেশের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় কেবল মাত্র দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক শান্তির পথ।'[১] তিনি আরো বলেছিলেন যে 'পাকিস্তান না হলে দেশে সাম্প্রদায়িক গোলমালে জড়িত থাকবে সাড়ে ছ কোটি মুসলমান আর পাকিস্তান হয়ে গেলে পড়ে থাকবে দুকোটি মুসলমান। .... আমার মনে হয় পাকিস্তান হিন্দুস্তানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করবে না কিন্তু তা যথেষ্ট পরিমাণে কমাবে।'[২] পাঞ্জাবে দেশভাগের সময় কার্যতঃ জনবিনিময় ঘটে, ফলে পূর্ব পাঞ্জাবে (ভারতের পাঞ্জাব) মুসলমান জনসংখ্যা ৩৩.১% থেকে কমে দাঁড়ায় ১.৮%। ফলে আম্বেদকারের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী পাঞ্জাবে গত ৬০ বছরে হিন্দু-মুসলমান বা শিখ-মুসলমান সমস্যা আর ঘটে নি, পাকিস্তান থেকে নিয়মিত উদ্বাস্তু আগমনও আর হয়নি। বাবাসাহেবের এই উপদেশ পশ্চিমবঙ্গ শোনেনি, তাই উদ্বাস্তু সমস্যার শেষ আজও হল না, হল না 'সাম্প্রদায়িক' সমস্যার সমাধানও। ফলে ১৯৫১ সালের ১৯ শতাংশ সংখ্যালঘু এখন বেড়ে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপরতার জন্য কতটা

রাষ্ট্র দায়ী আর কতটা মুসলমান সমাজের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দায়ী তা বিতর্কিত। বামফ্রন্ট সরকার সার্বিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র দূরীকরণে একেবারে ব্যর্থ, তার প্রভাব দরিদ্র মুসলমান সমাজসহ সব দরিদ্রকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এজন্য দারিদ্রকে মাপকাঠি করে যে উন্নয়নের কার্যক্রম নেওয়া প্রয়োজন তা ধর্মনির্বিশেষে কারও জন্যই নেওয়া হয়নি। ফলে মুসলমান সমাজ যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বলবার অপেক্ষা রাখে না । যথেষ্ট সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ঠিক একই অবস্থা ঘটেছে আদিবাসী ও অন্যান্য হিন্দু দরিদ্রতম মানুষদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু মুসলমান সমাজের এই পশ্চাদপরতার জন্য মুসলমান জনগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা ভাষাগত কোন সরকারি বিশেষ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মনে রাখতে হবে এই সংখ্যালঘু মুসলমানরাই কিন্তু ভারতে ও বাংলায় কয়েকশ বছর রাজত্ব করেছেন, ফলে এদেশে চিরকাল সংখ্যালঘুর দুরবস্থা তাঁদের কখনোই ছিল না। এর পর দু'শ বছরের ব্রিটিশ রাজত্বেও মুসলমানরা সংখ্যাগু রু হিন্দুদের শাসনে ছিলেন না। বরং যুক্ত বাংলায় স্বাধীনতার পূর্বে মুসলিম লীগই ছিল প্রধান শাসক দল। সেজন্যই একদা-শাসক সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুসমাজের চিরকাল নিপীড়িত তফসিলি সমাজের পশ্চাদপরতার তুলনা করা চলে না। স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলমান জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা ভাষাগত ক্ষেত্রে কোন সরকারি বিশেষ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। দীর্ঘকালীন অবিশ্বাসের জন্য বাড়িভাড়া থেকে বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানদের যে অনেক অসুবিধায় ভুগতে হয় তা অনস্বীকার্য। কিন্তু মুসলমান সমাজের উপর শারীরিক অত্যাচার, নারীদের উপর অত্যাচার, সম্পত্তির লুণ্ঠন বা বিতাড়ন -

এধরণের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে বিরল যা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ক্ষেত্রে অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা। এর জন্য (পরে আরো বিশদে আলোচনা করা হয়েছে) দেশভাগের প্রাথমিক ধাক্কার পর নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা চলে এসেছেন ও আসছেন।

ফলে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ তার দরিদ্র অংশের অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নতি তেমন না ঘটাতে পারলেও ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দাপটে যথেষ্ট শক্তিশালী। এই দাপটে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবস্থানকে ইতিমধ্যেই পাল্টাতে শুরু করেছেন। এই 'সংখ্যালঘু'দের দাপটে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন, এই 'সংখ্যালঘু'দের দাপটে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যাতে আরবি ভাষা ও ইসলামি বিষয় পড়া বাধ্যতামূলক। এর ছাত্রী ও অধ্যাপিকাদের বোরখা পরাও বেসরকারিভাবে বাধ্যতামূলক। এই 'সংখ্যালঘু'দের দাপটে ক্রমশঃ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের শিক্ষা হয়ে উঠছে ধর্মীয় মাদ্রাসা ভিত্তিক, অন্য কোন ধর্মের এরকম আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নেই। সংখ্যালঘু উন্নয়ন বলতে উলেমা ইমামদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মুসলমান সমাজকে। সুতরাং এই 'সংখ্যালঘু'দের দাপটে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ বহুমাত্রিক পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজের ধ্বংসের কাজ কমুনিস্ট, কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণে শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে একটি 'বিশেষ' সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বললে হয়ত ভুল হবে না।

২

সংখ্যালঘু যেখানে সংখ্যাগুরু

বিশ্বে

মনে রাখতে হবে মুসলমান সমাজের একটি আদর্শগত বিশ্ব ঐক্য রয়েছে। তার ধর্মীয় মানসে (যা মাদ্রাসা শিক্ষার ফলে আরো নিয়ত জোরদার হয়) একটি 'উম্মা'-র ধারণা রয়েছে -- যার অর্থ একটি বিশ্ব মুসলিম সমাজ। এরকম একটি বিশ্বজোড়া ধর্মীয় সমাজের ধারণা অন্য কোন প্রধান ধর্মে নেই। ইসলামে খুব গুরুত্ব দিয়ে মানবজাতির মধ্যে মুসলমানদেরই শ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়েছে। জনসংখ্যা অনুযায়ী ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী, অর্থবলেও ইসলামি অনেক দেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ভারতীয় বা আমেরিকান মুসলমানকে তাঁর ধর্মের জন্য সুদূর আরবে তীর্থ করতে যেতে হয়। সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়ার সুবাদে সাধারণ মুসলমানেরও এই আন্তর্জাতিক যোগাযোগটি ঘটে। ফলতঃ একটি অঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হলেও স্থানীয় মুসলিম সমাজের একটি বৃহত্তর মুসলিম সমাজের অংশ হিসেবেও অস্তিত্ব থাকে। যেমন আমরা দেখেছি যে ইসলামের খলিফার শাসন রক্ষার জন্য ভারতের মুসলমানরা বিখ্যাত খিলাফত আন্দোলন করেছিলেন এবং তার অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন মোহনদাস গান্ধী। যদিও খলিফা শাসনের মূল কেন্দ্র তুরস্কেই তখন প্রগতিশীলরা সেই শাসন তুলে দেবার জন্য লড়াই করছিলেন।

আজকের মুসলিম বিশ্ব পূর্বে এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া থেকে পশ্চিমে আফ্রিকার আলজিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত, মাঝখানে একমাত্র ভারত একটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজকের এই বৃহত্তর মুসলিম সমাজে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা অত্যন্ত দুর্বল

বরং ইসলামি শরিয়তী শাসনের প্রভাব মুখ্য। তুরস্কের মতন প্রায়-ইউরোপিয় ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এখন ইসলামি শাসনের দিকে এগোচ্ছে। সাধারণতঃ পৃথিবীর সব জায়গাতেই সংখ্যালঘু সমাজ কিছুটা রক্ষণশীল হয়, মনে করে স্থানীয় সংখ্যাগুরুরা তাদের বিশেষত্বকে খর্ব করতে চায়। সেজন্য তারা সামাজিক আদর্শের জন্য চেয়ে থাকে অন্যত্র তাদের সংখ্যাগুরু সমাজের উপর। গত তিন দশকে (ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে একটা শুরু ধরা যেতে পারে) বিশ্ব ইসলামি দুনিয়া ক্রমশঃ পিছনের দিকে হাঁটা শুরু করেছে। ঘরের পাশে পাকিস্তান বা বাংলাদেশও কোন প্রগতিশীল দিশা দেখাতে পারেনি। ফলে ভারতীয় ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগও ভয়ানক সংকুচিত। এর সামগ্রিক প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজেও প্রবলভাবে রয়েছে ও এই সমাজও ধর্মীয় গোঁড়ামিই পছন্দ করছে।

মুসলমান সংখ্যাগুরু দেশগুলিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেখা যাক। ইরানে ইসলামি বিপ্লব হবার পর গত ত্রিশ বছরে সেখানের ইহুদী, খ্রিস্টান বা জরথুস্ত্রপন্থী সংখ্যালঘুরা ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছেন।[৩] মিশরের সংখ্যালঘু কপটিক খ্রিস্টানদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া সত্ত্বেও (১০%) তাঁদের জনসংখ্যার সঠিক হিসেব পাওয়া দুষ্কর। বিশেষতঃ গত ৫০ বছর ধরে সেখানের ইসলামি রাষ্ট্রের কোপে পড়ে এই খ্রিস্টান জনসমাজের ধর্মীয় মন্দির নির্মাণ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রমে রয়েছে অনেক নিষেধাজ্ঞা, বারবার হয়েছে তাদের উপর আক্রমণ। ফলে খ্রিস্টান সম্প্রদায় নিঃশব্দে দেশ ছাড়ছেন। আর আব্রাহামি ধর্ম (ইহুদী, খ্রিস্টান, ইসলাম) ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে মিশর স্বীকার করে না ফলে মিশরের নাগরিকত্ব পেতে হলে হয় আব্রাহামি ধর্মের হতে হবে অথবা ধর্মকে উহ্য রাখতে হবে।[৪] ইসলামি ধর্মান্ধতার মূল

উৎস সৌদি আরবে তো ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মচর্চা নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রের সব আইনকানুন শরিয়ত মেনে চলে। মন্দির গির্জা গড়া যাবে না। এ অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যের আরবশাহীর প্রায় সব দেশেই। দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবৈষম্যের দায়ে একসময় সারা পৃথিবী একঘরে করে রেখেছিল, ধর্মবৈষম্যের জন্য কেন যে ইসলামের পীঠস্থানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রীরা ভুলে গেলেন তা এক সপ্তম আশ্চর্য। কামাল আতাতুরক প্রভাবিত ধর্মনিরপেক্ষ সামরিকবাহিনী ও মধ্যবিত্তশ্রেণির চেষ্টায় তুরস্ক দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক না হয়েও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখছিল, কিন্তু সম্প্রতি র্নিবাচনে জয়ী হয়ে একটি ইসলামি দল তুরস্ককে ধর্মীয় সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে।

এই ইসলামি অভ্যুদয়ের দাপটে পশ্চিম ইউরোপে যেখানে সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানরা বেশ কম (ব্রিটেনে ৩%, ফ্রান্সে ৮%) সেখানের সমাজও ইসলাম আতঙ্কে ভুগছে। লন্ডনের ভূগর্ভস্থ রেল, স্পেনের রেল, হল্যান্ডের চিত্রনির্মাতা (থিও ভ্যান গগ) বা লেখিকা (হিরসি আলি) সবাই আক্রান্ত। এই উম্মার এমনই মাহাত্ম্য যে আমেরিকায় একটি কোরান পোড়াবার কথা হয়েছিল, তাতেই দাঙ্গায় সুদূর আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে বেশ কিছু লোক হতাহত, এমনকি ভারতীয় পাঞ্জাবে যেখানে মুসলামান সংখ্যা অত্যন্ত কম সেখানেও মুসলমানরা একটি চার্চ পুড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ বামিয়ান বুদ্ধমূর্তিগুলি ধ্বংসের পর কোন বৌদ্ধ প্রধান দেশে বা অঞ্চলে কোন মুসলমান আক্রান্ত হন নি, বা গুজরাতে অক্ষরধাম মন্দির আক্রান্ত হলে তামিলনাড়ু বা পশ্চিমবঙ্গে কোন মসজিদ আক্রান্ত হয় নি।

এবার আমরা প্রাচ্যের দুটি দ্রুত উন্নয়নশীল মুসলিম দেশের দিকে নজর ঘোরাতে পারি যদিও মুসলমান ভাবজগতে এদের কোন প্রভাব নেই। মুসলিম ভাবনা যেহেতু এখনও আরবদুনিয়া-কেন্দ্রিক, এজন্য ইসলামি উম্মাকে অনেকে আরব সাম্রাজ্যবাদ বলেন। মালয়েশিয়া

তিন দশক আগেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ছিল না, এখন মুসলমানরা জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। ৪০% মানুষ অমুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। শুধু তাই নয় মালয়েশিয়ার সংবিধানের ১৬০ ধারা অনুযায়ী সব মালয় জনগোষ্ঠির লোককে মুসলমান হতেই হবে এবং তাদের বিচারব্যবস্থা চলবে শরিয়তি আইন মেনে। অন্য ধর্মগুলি কোন মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না কিন্তু মুসলমানরা তা পারবে।[৫] দিনে দিনে তাই সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীরা পারলে দেশ ছাড়ছেন। ৯০% মুসলিম ইন্দোনেশিয়া অনেকটা গণতন্ত্রী তবে বালি দ্বীপে থাকা মাত্র ৩% একেবারে নীরব হিন্দুদের মন্দিরের উপর ২০০5 ও ২০০৬ সালে আক্রমণ হয়েছে কয়েকবার।[৬] ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন ব্যবসার মূল আকর্ষণ বালি দ্বীপের উজ্জ্বল সংস্কৃতি যেখানে এখনো ভারতীয় তথা হিন্দু প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে এবং সেই সুবাদে বালির হিন্দুদের অস্তিত্ব এখনও রয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে ইসলামের বিশ্ব সমাজে মুক্ত বহুত্বমুখী গণতান্ত্রিক চিন্তার কোন দিশা কোথাও আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। বরং আমেরিকা-ইউরোপে সাংস্কৃতিক নিজস্বতা বজায় রাখার নাম করে ইসলামি গোঁড়ামি আরো জাঁকিয়ে বসেছে আর তাকে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের নামে সবচেয়ে সমর্থন জানাচ্ছেন বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীরা। যাঁরা জেসাস খ্রাইস্ট সুপারস্টার নাটক চালিয়ে যায় বছরের পর বছর, নোবেল বিজয়ী হোসে সারামাগো লেখেন গসপেল এর্কডিং টু জেসাস খ্রাইস্ট-এর মতন উপন্যাস, সেই সমাজের বুদ্ধিজীবিরা হজরত মহম্মদ নিয়ে বিন্দুমাত্র ঠাট্টা-তামাসার বিরোধী, সেখানে ইসলামের সমালোচনা করে চিত্রনির্মাতা খুন হলেও তেমন প্রতিবাদ চোখে পড়ে না।

প্রতিবেশী

এবার দেখা যাক আমাদের একেবারে কাছের প্রতিবেশী দেশগুলির অবস্থা। আমাদের প্রতিবেশী বলতে এখন সার্ক-ভুক্ত (সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন) ৮টি দেশকে ধরা যেতে পারে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভুটান, আফগানিস্তান। এর মধ্যে ৪টি দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের অবস্থাটা দেখে নেওয়া যাক।

আফগানিস্তান সরকারিভাবেই একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র, এর আইন কানুন চলে কট্টর ইসলামি রীতিনীতি মেনেই। একদা বৌদ্ধ দেশে এখন ৯৯% মানুষ মুসলামান। তবু হাতে গোনা কয়েকটি শিখ পরিবার অত্যাচার থেকে বাঁচে না, বাঁচে না পাথরের বুদ্ধমূর্তিও। দেশের অনেকাংশ ইসলামি তালিবানদের অধীনে।

পর্যটকদের প্রিয় মালদ্বীপ সম্পূর্ণ ইসলামি দেশ। এখানে অন্য কোন ধর্মচর্চা নিষেধ। এমনকি মালদ্বীপের কোন নাগরিক অন্য কোন ধর্ম গ্রহণও করতে পারেন না। এবছর, ২০১০ সালে, ইসমাইল মহম্মদ দিদি নামক একজন মালদ্বীপের নাগরিক নাস্তিক জানতে পেরে সরকার তার বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। সে বেচারা প্রথমে লন্ডনে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় চায় ও পরে আত্মহত্যা করে।[৭]

পাকিস্তান একটি ঘোষিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র যার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। পাকিস্তানের ভিত্তিই হল ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব দেশের স্থাপনা। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৯৬% মুসলমান, ১.৫% খ্রিস্টান ও ১ % হিন্দু। জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানকে আরো ইসলামিকরণের পথে নিয়ে যান। হুদুদ অর্ডিন্যান্স জারী করে মুসলিম সম্প্রদায়কে শরিয়তি আইনের অন্তর্গত করেন। এর

কিছু ধারায় অমুসলমানরাও অন্তর্গত হয়। ১৯৮০ সালে জারী হয় ব্লাসফেমি আইন যার দ্বারা হজরত মহম্মদ বা ইসলাম সম্পর্কে কোনরকম অবমাননা নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া ইসলাম প্রচার-প্রসারে রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে যুক্ত থাকে। এর ফলে পাকিস্তান এখন বিশ্ব ইসলামি সন্ত্রাসবাদের অন্যতম কেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়। এই সর্বব্যাপী ইসলামি প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র খ্রিস্টান ও প্রায় নিঃশেষিত হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়। ১৯৯২ সালে ভারতে বাবরি সৌধ ধ্বংসের পর পাকিস্তানে হাতে-গোনা কয়েকটি রয়ে-যাওয়া হিন্দু মন্দির আক্রান্ত হয়।

আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র কিন্তু তার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুসলমান ৯০%, হিন্দু ৯%। বাংলাদেশ বারবার সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে গেলেও এর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বারবার ফিরে এসেছে। সরাসরি সংখ্যালঘু বিরোধী আইন না থাকলেও পাকিস্তান আমলের শত্রু সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ও অর্থনীতিকে ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ হবার পর এই আইন নাম বদলে হয় 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' (Vested Property Act) এবং এই আইনে একই ভাবে হিন্দুদের সম্পত্তি জবরদখল চলে। এই আইনের ফলে বিপুল হিন্দু জমি ও সম্পত্তি দখল হয়। এ বিষয়ে বিশদ গবেষণা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবুল বরকত এবং এই অসাধারণ গবেষণার জন্য তিনি এখন বিশ্বখ্যাত।[৮] এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান আমলের মতন ধারাবাহিক হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর শারীরিক আক্রমণ, ধর্মস্থান ধ্বংস, নারীদের লাঞ্ছনা, জমি ও সম্পত্তি লুণ্ঠন অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯০ সালে বাবরি মসজিদ আক্রান্ত হওয়ার পর (সে সময় ধ্বংস হয়নি, কয়েকশো লোক তার ওপর চড়ে বসে) সারা

বাংলাদেশ জুড়ে দাঙ্গা হয়। বাঙ্গালী মুসলমানেরা হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেই ক্ষান্ত থাকেনি, হিন্দুদের দোকান-বাড়ী-ঘর লুট করা, এমনকি ঢাকার বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দির এবং চট্টগ্রামের কৈবল্যধাম ভাঙচুর ও তছনছ করে। ১৯৯২-এ ভারতে (মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের কোন মসজিদ ভাঙার জন্য নয়) বাবরি মসজিদ ভাঙার পর যে ভয়ঙ্কর তান্ডব চলে তাতে ২৮,০০০ বাড়ি-ঘর, ৩,৬০০ মন্দির, ২,৫০০ দোকান-বাজার ধ্বংস হয়। খুন হন ১৩ জন।[৯] ২০০১-এ বেগম জিয়ার নির্বাচনের পর থেকে শুরু হয় ধারাবাহিক সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতন।[১০] এর ফলে ১৯৫১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ, ১৯৭৪-এ ১৩.৫% ও ২০০১ সালে ৯.২ শতাংশে নেমে এসেছে, ২০১১-র জনগণনায় সম্ভবতঃ তা নেমে দাঁড়াবে ৭-৮ শতাংশে। অধ্যাপক বরকত তাঁর বইয়ে হিসাব করে বলেছেন যে ১৯৭১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে ৬৩ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে উধাও হয়ে গেছেন। '১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ এ এই নিখোঁজ হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রতিদিন গড়ে ৭০৫ জন। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ তে প্রতিদিন গড়ে ৫২১ জন, ১৯৮১-১৯৯১ এ প্রতিদিন গড়ে ৪৩৮ জন এবং এই সংখ্যাটি অনেক বেড়ে ১৯৯১ থেকে ২০০১ এ দাঁড়ায় প্রতিদিন গড়ে ৭৬৭ জন।'[১১] এই উদ্বাস্তু আগমন এখনও রোজ চলছে। বাংলাদেশের আছঅই গবেষকের অধ্যয়ণে বিষয়টিকে এ ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া'।[১২]

এবার দেখা যাক প্রতিবেশী চারটি অ-মুসলমান দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের কি অবস্থা।[১৩]

শ্রীলংকা একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এর কোন রাষ্ট্রধর্ম নেই। এখানের ৭০% বৌদ্ধ, ১৫% হিন্দু ও ৮% মুসলমান। এখানে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্বমূলক বা বিরোধী কোন আইন নেই। সব

সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন (বিবাহ, সম্পত্তি) ছাড়া আইনে ধর্মের কোন স্বীকৃতি নেই। ধর্মীয় কারণে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করছেন না।

নেপাল একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র। এর কোন রাষ্ট্রধর্ম নেই। এখানের ৮০% হিন্দু, ১১% বৌদ্ধ, ও ৭% মুসলমান। এখানে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্বমূলক বা বিরোধী কোন আইন নেই। নেপালের সংবিধানের ২৩তম ধারায় সব ধর্মাচরণের স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু যে কোন ধর্মান্তরকরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মীয় কারণে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করছেন না।

ভুটান একটি রাজতন্ত্র যদিও তা গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরী ও নির্বাচনের জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে। এখানে ৯০% বৌদ্ধ ও ১০% হিন্দু। ভুটানে কোন রাষ্ট্রধর্ম নেই ও সব ধর্মের সমানাধিকার রয়েছে। তবে ভুটান সরকার ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে কড়া মনোভাব নিচ্ছে। ধর্মীয় কারণে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করছেন না।

ভারত তার সংবিধান অনুযায়ী একটি সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। এখানে কোন রাষ্ট্রধর্ম নেই। ২০০১-এ জনসংখ্যার ৮০.৬% হিন্দু ও ১৩.৪% মুসলমান। আইনগতভাবে এখানে কোন ধর্মাচরণে কোন বাধা নেই। ভারতে জনসংখ্যায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুপাত ১৯৫১ সালে ১০.৪% থেকে বেড়ে ২০০১ সালে ১৩.৪% হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই বৃদ্ধি আরো অনেক বেশী। বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুন্নত অংশের জন্য সরকারিভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। ধর্মীয় কারণে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করছেন না।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতকে নিয়ে প্রতিবেশী ৮টি দেশের ৪টি মুসলমানপ্রধান দেশেই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে সব দেশেই ইসলামি ধর্মীয় আইনের কড়াকড়ি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি ২টি হিন্দুপ্রধান ও ২টি

বৌদ্ধপ্রধান দেশের সরকারি ব্যবস্থায় ধর্মীয় প্রভাব অনুপস্থিত। মুসলমান প্রধান ও অপ্রধান দেশের পার্থক্য এখন নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ

দেশ	রাষ্ট্রধর্ম	আইনী বিধিনিষেধ	বিশেষ ব্যবস্থা
আফগানিস্তান	ইসলাম	ইসলামি মতে আইন	
মালদ্বীপ	ইসলাম	শরিয়তি আইন	মালদ্বীপের নাগরিক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মও গ্রহণ করতে পারেন না
পাকিস্তান	ইসলাম	হুদুদ অর্ডিন্যান্সের দ্বারা মুসলিম সম্প্রদায় শরিয়তি আইনের অর্ন্তগত	ব্লাসফেমি আইন যার দ্বারা হজরত মহম্মদ বা ইসলাম সম্পর্কে কোনরকম অবমাননা নিষিদ্ধ
বাংলাদেশ	ইসলাম	অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দুদের সম্পত্তি জবরদখল	ধর্মীয় অত্যাচারে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্রুত হ্রাস

অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ

<table>
<tr><th>দেশ</th><th>রাষ্ট্রধর্ম</th><th>আইনী বিধি নিষেধ</th><th>বিশেষ ব্যবস্থা</th></tr>
<tr><td>শ্রীলংকা</td><td rowspan="4">নেই</td><td rowspan="2">কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্বমূলক বা বিরোধী কোন আইন নেই</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>ভারত</td></tr>
<tr><td>নেপাল</td><td rowspan="2"></td><td>ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ</td></tr>
<tr><td>ভুটান</td><td>ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ</td></tr>
</table>

৩

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষ ভবিষ্যৎ

ইসলামি বিশ্বে বা প্রতিবেশী মুসলমানপ্রধান দেশে যে সম্প্রদায়ের কোন ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র খুঁজে পাওয়া ভার, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সেই সমাজের মূলধারার কাছে অন্য কোন ভাবনা আশা করার কোন কারণ থাকতে পারে না। মুসলমান সমাজের এই বিশ্ব ও প্রতিবেশী অবস্থানকে মনে রেখে আমরা এবার পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থানের পর্যালোচনা শুরু করতে পারি।

শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানের সামগ্রিক পশ্চাদপরতা এবং তার উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা নিয়ে এই লেখকের কোন দ্বিমত নেই। একজন হিন্দু বা খ্রিস্টানের ক্ষেত্রে এরকম অবস্থায় যেসব কর্মকান্ডের প্রয়োজন একজন মুসলমানের ক্ষেত্রে তা অন্যরকম হবার কোন কারণ নেই। একটি সমাজের পশ্চাদপরতার অন্যতম কারণ শিক্ষা। শিক্ষার অগ্রসরতার জন্য জন্য প্রয়োজন অনেক বিদ্যালয়। কিন্তু সব ধর্মের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় দরকার হলেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য নাকি চাই মাদ্রাসা। আমাদের আগমার্কা কমুনিস্ট সরকারের এটা গর্বের বিষয়। তাদের সর্বশেষ পুস্তিকায়এই সাফল্যের কথা বিস্তারিত জানানো হয়েছে - ১৯৭৭ সালে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৩৮৮, তা ২০১০-এ বেড়ে হয়েছে ৪,৫০,০০০, ১০০গুণ বৃদ্ধি! টাকা খরচ বেড়েছে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার থেকে ৬১০ কোটি![14] এই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কতিপয় মুক্তমনা মুসলমান যেমন গিয়াসুদ্দিন (ধর্মমুক্ত মানবতাবাদী সংগঠন) লেখেন 'মুসলিম সমাজ আজ যে সবচেয়ে বেশী পশ্চাৎপদ তার অনেকাংশে দায়ী এই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা এবং মুসলিম সমাজের

মাদ্রাসা সংস্কৃতি।'[১৫] আর মাদ্রাসার পক্ষে থাকে সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেস থেকে তাবৎ নকশাল বা এপিডিআর-এনজিওরা এবং নীরব সমর্থক বুদ্ধিজীবি/বিদ্বজ্জনেরা। এখন তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সিপিএমের মধ্যে মাদ্রাসা স্থাপনের প্রতিযোগিতা চলেছে অথচ বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মুক্তমনা মানুষেরা সবাই এর বিরুদ্ধে।

মাদ্রাসায় আপত্তি কিসের? অন্য কোন ধর্মের যখন আলাদা এরকম সরকার-স্বীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা নেই তখন হঠাৎ মুসলমানদেরই বা থাকবে কেন? রামকৃষ্ণ মিশন বা সেন্ট জেভিয়াসের্র ছাত্রছাত্রীরা কোন হিন্দু বা খ্রিস্টান শিক্ষা বোডের্র সিলেবাসে পড়াশোনা করে না, তারা রাজ্যের বা কেন্দ্রিয় কোন অধর্মীয় বোর্ডের সিলেবাসেই পড়াশোনা করে। তাহলে মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের কোন পাপের জন্য তাদের মধ্যযুগীয় কারাগারে পাঠাতে তৃণমূল সিপিএম থেকে নকশালরাও একপায়ে খাড়া? এখানেই শুরু সমস্যার। এই মাদ্রাসায় কি পড়ানো হয়? সাধারণ স্কুলের পাঠক্রম ছাড়া এতে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি র্পযন্ত পড়তে হবে আরবি ভাষা, ইসলাম পরিচয়, কোরান, হাদিস, আকায়িদ, ফিকাহ্, ফারায়েজ, মুসলমান মনীষীদের কথা ইত্যাদি। এসব তারা পড়বে দশ বছর ধরে, একেবারে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত।[১৬] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাদ্রাসা বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাঠ্যক্রমের এই ইসলামি বিষয়গুলি দেওয়া নেই, এ এক ধরণের ভয়ানক কমুনিস্ট ভন্ডামী ও মিথ্যাচার। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যই একজনকে ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষিত করে পুরোপুরি মুসলমান তৈরী করা। সারা বিশ্বের ও প্রতিবেশী মুসলামান দেশগুলির উদাহরণ জানার পর এই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে আমরা কি গণতন্ত্র, পরধর্মসহিষ্ণুতা, বহুমতসহিষ্ণুতা আশা করতে পারি? না, পারি না। বামপন্থী সরকারের মূলতঃ উচ্চবর্ণের নেতারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজি শিখিয়ে দরিদ্র জনতাকে ইংরাজি•

ভুলিয়ে সমাজে যেমন দুটি স্তর তৈরী করেছে -- তেমনি মাদ্রাসা শিক্ষা আরবি-জানা ও না-জানা দুধরণের বাঙালি তৈরি করছে। অথচ একজন বাঙালি মুসলমানের আরবি জানার কোন দরকার নেই, কারণ কোরান হাদিস সবই বাংলায় পাওয়া যায়।

এই ভয়াবহ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারণ ঘটেছে কলকাতায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে যেখানে মাদ্রাসার মতন আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইসলামি রীতি মেনে ছাত্রীদের বোরখা পরা বাধ্যতামুলক করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদেরও বোরখা পরার ফতোয়া জারী করেছে মাদ্রাসা ছাত্র সংগঠন। মুসলিম শিক্ষিকা শিরিন মিদ্যা তা মানতে অস্বীকার করায় তাঁকে ক্লাস নিতে দেওয়া হচ্ছে না। এই সংবাদ প্রকাশের পরেও আজ পর্যন্ত কোন নারী সংগঠন, প্রধান ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংগঠন, রোজ টিভি-সংবাদপত্র আলো করা বুদ্ধিজীবি/বিদ্বজ্জন কোন আন্দোলন তো দূরের কথা -- এর প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নি। মাদ্রাসা শিক্ষিত এই সংখ্যালঘু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা।

নেতৃত্ব

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের এখনও কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল নেই। জনসংখ্যায় কেরালার মতন মুসলমানদের অনুপাত হলেও দেশভাগ, মুসলিম মধ্যবিত্তের অনুপস্থিতি ও ধনী বাঙালি মুসলমান গোষ্ঠীর অভাবে এখানে মুসলিম লীগের মতন কোন দলের প্রভাবশালী উপস্থিতি এখনও নেই। এই অভাবটি মুসলমান ধর্মীয় নেতৃত্ব অবস্থা মতন কংগ্রেস ও সিপিআইএমের মধ্য দিয়ে মিটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে কংগ্রেস ও সিপিআইএম (সব কমুনিস্টদেরও ধরা যেতে পারে) মুসলমান ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরোধিতায় কোন রকম সমাজ সংস্কারের চেষ্টাটুকুও করে নি। এর বড় কারণ অবশ্য ভোট। ফলে ৩২ বছরের কমুনিস্ট রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজ তার

নিজস্ব ধর্মীয় আবহেই রয়েছে। পরিবর্তনের হাওয়ায় বঞ্চিত মুসলমান সমাজ এখন সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে আর তার নেতৃত্ব দিচ্ছে কয়েকজন ইমাম। কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বা ফুরফুরা শরীফের ইমাম এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের ইসলামি মুখ। এই ইমামরাই যখন তসলিমা নাসরিনের সব রকমের বেআইনী ফতোয়া জারী করেছিলেন তখন সিপিআইএম ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা তাঁদের নীরবে সমর্থন করেছেন। তসলিমা সংক্রান্ত মামলা যখন কলকাতা উচ্চ আদালতে চলতো তখন একদল মাদ্রাসা ছাত্র আরবি পোষাক পড়ে বিক্ষোভ দেখাত। এই মুসলিম শক্তি তসলিমা নাসরিনকে মেদিনীপুরে কবিতা পাঠ করতে দেয় নি, শিলিগুড়িতে বইমেলা উদ্বোধন করতে দেয়নি। পশ্চিমবঙ্গের কবিকুল, বুদ্ধিজীবি (তখনও বিদ্বজ্জনেদের জন্ম হয় নি), নারী সংগঠনেরা মজা দেখেছেন। মনে রাখতে হবে আজকের পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনের ঝড় প্রথম তোলেন মুসলিম ধর্মীয় দল জামাতে উলেমা হিন্দের জনাব সিদ্দিকুল্লা। সিঙ্গুরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ও মমতা দেবীর ২৬ দিনের অনশনের পরও কোন অগ্রগতি হয় নি। ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৬-এ ২৫ দিন পর যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে অনশন বন্ধ করেন তখনও পরিবর্তনের কথা শোনা যেত না। অনশন শেষের ৫ দিন পরে ৩ জানুয়ারি ২০০৭-এ নন্দীগ্রামে জমি জরীপ করবার সরকারি দলের উপর আক্রমণ চালায় জামাতে উলেমা হিন্দের কর্মীরা। পুলিশের জীপে আগুন ধরানো হয়, রাস্তা কেটে দেওয়া হয়। এই প্রথম জমি রক্ষার জন্য হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন সিদ্দিকুল্লা। এই শুরু ঘুরে দাঁড়ানো, এতে পুলিশ কর্মী খুন হন, দলেদলে সিপিএম সমর্থকরা ঘরছাড়া হন। পরে এই আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে চলে যায় যদিও এজন্য সিদ্দিকুল্লা সাহেব

তাঁর দল নিয়ে এই আন্দোলনে পৃথক হয়ে যান। সবশেষে একদা কংগ্রেস বর্তমানে তৃণমুল নেতা ইদ্রিস আলির নেতৃত্বে ২১ নভেম্বর ২০০৭ সালে তসলিমা বিতাড়নের দাবীতে এই মুসলিম জনতার সারাদিন ধরে কলকাতায় তান্ডব সব রাজনৈতিক দল নীরবে সমর্থন করেছে ও এই মৌলবাদী দাবী মেনে সিপিআইএম তাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহিস্কার করেছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদী সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব এখন প্রতিষ্ঠিত, মাদ্রাসা শিক্ষা তাকে আরো দিনদিন জোরদার করবে। কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন একটি সাম্প্রদায়িক কেন্দ্র স্থাপনের পর কেরালার মতন একটি মুসলিম দল তৈরি হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের গতিপথ মধ্যপ্রাচ্যের পথেই। পরিবর্তনের পর এর আসল মেজাজ টের পাওয়া যাবে।

মুসলমান জনসংখ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব

১৯৪৭ সালে অ-মুসলিমপ্রধান রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম। ১৯৪৭ সাালের ২০শে জুন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরী হল পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সমস্ত অ-মুসলিম সদস্যরা, এমনকি কমুনিষ্টরাও ভাঙাচোরা পশ্চিমবঙ্গের স্বপক্ষেই ছিলেন। অমুসলিমপ্রধান অঞ্চলের সদস্যরা ৫৮-২১ ভোটে বাংলাভাগের পক্ষে ও পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন।[১৭] কমিউনিষ্ট সদস্যদের একজন ছিলেন শ্রী জ্যোতি বসু। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের একটি প্রধান সর্ত অ-মুসলিম জনসংখ্যার প্রাধান্য। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ এই দশ বছর বাংলার মুসলমান গরিষ্ঠ জোট সরকারের শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও তিরিশ বছরে একের পর এক দাঙ্গা ও নোয়াখালির বিভীষিকাময় গণহত্যা বাঙালী হিন্দুকে পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহী করে দেয়।[১৮] মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গ

কোন হিন্দু ধর্মীয় রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে অ-মুসলিমপ্রধান রাজ্য হতে চায় নি, চেয়েছে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক দেশের অংশ হতে। এই চাওয়াটি যে যথেষ্ট সঙ্গত হয়েছিল তা আমাদের প্রতিবেশী ও বিশ্বের মুসলমান প্রধান দেশগুলির উদাহরণ দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ধর্মীয় চরিত্র নিয়ে আলোচনা একেবারেই নিষিদ্ধ। এর ফলে গত ষাট বছরে, বিশেষত: গত ত্রিশ বছরে যে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জন-মানচিত্রটি দ্রুত বদলে গেছে ও বদলাচ্ছে তা নিয়ে কোন আলোচনা একাডেমিক মহলেও প্রায় হয় না। (এ নিয়ে বিশদ আলোচনা দেখুন - অনুপ্রবেশ , অস্বীকৃত উদ্বাস্তু ও পশ্চিমবঙ্গের অনিশ্চিত অস্তিত্ব - মোহিত রায়, অনুষ্টুপ, শারদীয় ২০০৯)।[১৯] পূর্ব পাকিস্তান / বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী ভারতে (পশ্চিমবঙ্গে সিংহভাগ) এলেও পাটিগণিতের হিসেব উল্টে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বেড়ে চলেছে। একবার হিসেবটা দেখা নেওয়া যাক।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় জনসংখ্যা শতাংশে (%)

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
হিন্দু	৭৮.৪৫	৭৮.৮০	৭৮.১১	৭৬.৯৬	৭৪.৭২	৭২.৪৭
মুসলমান	১৯.৮৫	২০.০০	২০.৪৬	২১.৫১	২৩.৬১	২৫.২৫

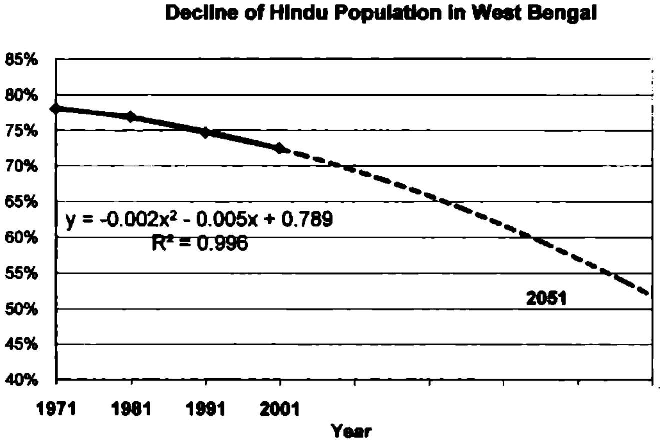
এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনমানচিত্রের ভবিষ্যৎ কি? কোন বক্তব্যে না গিয়ে সোজা অংকে চলে যাওয়া যাক। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের বর্তমান হার বজায় থাকলে রেখ-চিত্রের মাধ্যমে আগামী দিনের সম্ভাব্য জনসংখ্যা পরিস্থিতির তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এই রেখচিত্র দেখাচ্ছে যে ২০৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ৫০%-এর কম হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা

সাল	জনসংখ্যার %
১৯৭১	৭৮.১১%
১৯৮১	৭৬.৯৬%
১৯৯১	৭৪.৭২%
২০০১	৭২.৪৭%

পশ্চিমবঙ্গে সম্ভাব্য হিন্দু জনসংখ্যা

সাল	জনসংখ্যার %
২০১১	৬৯.২৮
২০২১	৬৫.৬৬
২০৫১	৫১.৪৪
২০৫৩	৪৯.৭৪



ঘটনাটি অবশ্য ২০৫৩-র অনেক আগেই ঘটবে কারণ ২০০১-এ পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা যখন ২৫.২%, তখন তাঁদের শিশুদের (০-৬ বছর) সংখ্যা ৩৩.১৭%! ফলে নতুন প্রজন্মে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক হার আরো বেড়ে যাবে। এই হল আগামীদিনের পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের চিত্র।

মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি রাজ্যে শুধু মুসলিম ভোটারই বৃদ্ধি করেনি, এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পুরস্কার হিসেবে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচনী কেন্দ্রও বেড়ে গেছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নতুন করে নির্বাচনী এলাকা ঠিক হওয়ার পর, কলকাতায় বিধানসভা কেন্দ্র কমে ২১ থেকে হয়েছে ১১। হিন্দু-অধ্যুষিত পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে কমেছে দুটি করে কেন্দ্র, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলীতে একটি করে। আর বেড়েছে সীমান্তের মুসলিম-অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদে ৩টি, উত্তর দিনাজপুর ও নদীয়ায় ২টি করে আর মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ১টি করে। খুব পরিষ্কার চিত্র -- সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নির্বাচনী কেন্দ্র বেড়ে গেছে।

মুসলমান-প্রধান পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান-প্রধান হয়ে গেলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বেরই কোন প্রয়োজন থাকে না। যেমন কমুনিস্ট শাসন উঠে গেলে পূর্ব জার্মানির অস্তিত্বের আর প্রয়োজন থাকেনি বা কমুনিস্ট শাসন উঠে গেলে দুই কোরিয়া এক হয়ে যাবে একদিনেই। মুসলমান-প্রধান রাজ্য হলে কি হয় তার কিছু দেশীয় নিদর্শন আমাদের হাতের কাছেই আছে। মুসলমান-প্রধান পাকিস্তান থেকে প্রায় সব হিন্দুই বিতাড়িত। মুসলমান-প্রধান পূর্ব পাকিস্তান / বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ থেকে কমে ৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতে মুসলমান-প্রধান কাশ্মীর উপত্যকা থেকে সব হিন্দু বিতাড়িত।

এ প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে-যাওয়া তফসিলি সমাজের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার অভিজ্ঞতা দেখা যাক। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ছিলেন বাংলার তফসিলি জাতিদের প্রধান নেতা, যিনি তফসিলি জাতি ও মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ও প্রচারক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান গঠনের পক্ষে ছিলেন ও তফসিলি সমাজকে পাকিস্তানেই থাকতে বলেছিলেন। দিল্লিতে ৫ নভেম্বর ১৯৪৬এ এক জনসভায় যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বলেন 'হিন্দুদের আওতায় থাকিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করার চেয়ে মুসলমান অথবা অন্য কোন জাতির আওতায় স্বাধীন ও সম্মানের সহিত বাস করিতে তফসিলি জাতি বেশী পছন্দ করে।'[২০] দেশভাগের পর তাঁকে সসম্মানে পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালের পাকিস্তানে হিন্দুবিরোধী (তফসিলি-সহ) দাঙ্গার পর মুসলিম লিগের কাছের মানুষ এই মন্ত্রীমশাইকে তিন বছরের মধ্যেই কল্পিত স্বর্গরাজ্য ছেড়ে 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' হিন্দুস্থানে পালাতে হয় এবং হিন্দুস্থানে থেকেই তিনি পদত্যাগপত্র পাঠান। ১৯৫০ সালের ৮ই অক্টোবর, পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খান সরকারের আইন ও শ্রম মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগ পত্রে যোগেনবাবু লেখেন -

'আমার পক্ষে এটা বলা অন্যায্য নয় যে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে 'নিজভূমে পরবাসী' করা হয়েছে, আর এটাই এখন হিন্দুদের কাছে পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করাটাই এদের একমাত্র অপরাধ। .... সুদীর্ঘ ও উদ্বেগময় সংগ্রামের পর শেষ পর্যন্ত আমাকে একথাই বলতে হচ্ছে যে পাকিস্তান আর হিন্দুদের বাসযোগ্য নয়। তাঁদের ভবিষ্যতে প্রাণনাশ ও ধর্মান্তরকরণের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে। অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু ও রাজনৈতিক সচেতন তফসিলি জাতির লোকেরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। যে সমস্ত হিন্দুরা এই অভিশপ্ত দেশে

অর্থাৎ পাকিস্তানে থেকে যাবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধীরে ধীরে এবং সুপরিকল্পিত ভাবে তাদের মুসলমানে পরিণত করা হবে বা নিশ্চিহ্ন করা হবে।'[২১]

সাম্প্রতিক কালে উদ্বাস্তু মতুয়া সমাজের কথা পত্র পত্রিকায় আলোচিত হচ্ছে। তফসিলি সমাজের একটি বড় জনগোষ্ঠী এই ধর্মীয় সংঘের সঙ্গে যুক্ত। এঁদের শ্রদ্ধেয় নেতা প্রয়াত প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে (এঁনার স্ত্রী এখন বড়মা বলে পরিচিত) পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে বনগাঁর কাছে বর্তমান ঠাকুরনগরে বসবাস শুরু করেন। দেশ ছাড়ার আগে তিনি শেষ জনসভা করেন নড়াইলের জমিদারবাড়ীর প্রাঙ্গণে। সেখানে মতুয়া ভক্তবৃন্দদের বলেন - "কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করায় দেশ খন্ডিত হবার পথে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে আবার আমাদের দাঙ্গার সম্মুখীন হতে হবে। ভবিষ্যতে আমাদের বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এখন আমাদের কী করনীয়? নিঃসন্দেহে আমরা বিশাল হিন্দু সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সংকটময় মুহূর্তে তফসিলিদের নিজেদের স্বার্থে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মূল কান্ড থেকে কোন শাখাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সেটি অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। স্বধর্মের কোটি কোটি হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে লীগের বন্ধুত্ব অচিরেই তফসিলি জাতির বিপদ ডেকে আনবে। আপাত উন্নতির মোহে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মিঃ জিন্নাহ্‌র মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন পরিণামে অপরিসীম ক্ষতি ডেকে আনবে।" ......

"কিছুদিনের মধ্যে দেশভাগ হয়ে যাবে। দেশভাগের ফলে আমাদের জন্মভূমি যদি পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে, আমরা যেন সকলে এক থাকি। ফেডারেশন ও লীগের কথায় না ভুলি। ভারতভূমিতে আমরা

যেন সকলে এক সাথে চলে যেতে পারি। আমার অনুপস্থিতিতে আপনারা যেন সংঘবদ্ধ থাকেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করেন যা আমি আগেই আপনাদের বলেছি।"[২২]

যে সমাজের সর্বোচ্চ নেতাকে মুসলিমদের অত্যাচারের জন্য নিজের বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় ও যিনি পরিস্কারভাবে তার ভক্তদের প্রতি তার বক্তব্য রেখে গেছেন - আজ সেই মতুয়া সমাজের কিছু নেতা বাংলাদেশের ইসলামি অত্যাচার নিয়ে ন্যূনতম কথাও বলেন না, বরং সভা করে দলিত-মুসলিম ঐক্যের প্রচার চালান। আজকে যারা মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উপর বামফ্রন্টের অত্যচারের জন্য চেঁচামিচি করছেন তারা ভুলেও বলেন না যে এঁরা আদৌ উদ্বাস্তু কেন হলেন।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে ধর্মীয় শাসনের বাঁধন বেশ প্রবল। মুর্শিদাবাদে শরিয়তী আদালত খুবই চালু। এখানে ইসলামি মেজাজ এতই প্রবল যে ২০০৮-এর জুলাই মাসে একটি শরিয়তী আদালত একটি হিন্দু যুবককে মৃত্যুদন্ড দেয় ও তার মাথা কেটে তা কার্যকরী করে। এই যুবকের সাথে স্থানীয় একটি মুসলিম মেয়ের সঙ্গে মুম্বাইতে পরিচয় হয়। মুসলিম মেয়েটি মুম্বাইতে কাজে গিয়েছিল, তারা বিয়ে করে ও তাদের একটি পুত্রসন্তান আছে। যখন এই দম্পতি মেয়েটির গ্রামে বেড়াতে আসে তখন এই ছেলেটির ধর্মপরিচয় জেনে গ্রামের শরিয়তী আদালত তাকে হত্যা করে।[২৩] এটা কোনও সৌদি আরব বা পাকিস্তানের ঘটনা নয়, প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা।

৪

দেগঙ্গা - নীরবতাই পথ?

জনসংখ্যা, মাদ্রাসা, বাংলাদেশের হিন্দুদের অবস্থা, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১ কোটি নাগরিকত্বহীন উদ্বাস্তু, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, শিরিন মিদ্যা -- এসব নিয়ে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করছে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব

ধরণের মিডিয়া, পত্রপত্রিকা, সদা-বিপ্লবী লিটল ম্যাগাজিনেরা এমনকি ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, লোকনাথ আশ্রমসহ তাবৎ হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলিও। শুধু নীরবতা নয়, এ নিয়ে নীরবতা ভাঙার চেষ্টাও অপরাধ। ফলে সাধারণ মানুষ এসব নিয়ে একেবারেই কিছু জানতে পারেন না। ফলে কখনও সাধারণ আড্ডায় এসব প্রসঙ্গ উঠলে নিত্য কালিঘাট যাওয়া ভক্ত বন্ধুও মনে করেন যে এসব দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা হিন্দুত্ববাদী অতিরঞ্জিত প্রচার। একেবারে একটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলা যাক।

কলকাতা থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরে দেগঙ্গা, বারাসত থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার। ৬,৭,৮ সেপ্টেম্বর তিন দিন ধরে দফায় দফায় দাঙ্গা চলে দেগঙ্গা অঞ্চলে। ৮ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে 'পুড়ল ৫০টি বাড়ি ও দোকান। ... ৩০০টি দোকান ও বাড়িতে চলল ভাঙচুর।'[২৪] সেনাও নামান হল। ৮ সেপ্টেম্বর সেনা টহলের মধ্যেই লুঠ চলে।,[২৫, ২৬] এরপর থেকে চলল নীরবতা। কারা আক্রান্ত হলেন? কাদের বাড়ি-দোকান পুড়ল? না কোন বাংলা পত্রিকাতেই এনিয়ে কিছু পাওয়া যাবে না। এতবড় ঘটনা, মিলিটারি নামলো, কলকাতার এত কাছে -- না -- কোন বিদ্বজ্জন / বুদ্ধিজীবি, আগুনঝরানো মানবাধিকার নেতা / এনজিও একটি শব্দও করেন নি। এমনকি টিভি-মিডিয়া যারা খবরের অভাবে প্রায় বাড়ির ভাইয়ে ভাইয়ে পারিবারিক ঝগড়ারও লাইভ কভারেজ করে তারাও কলকাতার এত কাছের সার সার ভাঙা বাড়ি পোড়া দোকানের বা আক্রান্তদের কোন ছবিই দেখাতে সাহস করলেন না। প্রায় একমাস পর ৫ অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে যে ক্ষতিগ্রস্ত ১৬৭টি পরিবারের হাতে ১ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য তুলে দিল সরকার।[২৭] ১ কোটি টাকা! কারা পেলেন এত টাকা? না, তাও কাগজ জানায় নি। কেন এই নীরবতা? কারণ ক্ষতিগ্রস্তরা সবাই হিন্দু। আক্রমণকারীরা

সবাই মুসলমান।

দাঙ্গা নয়, পাকিস্তান-বাংলাদেশের মতন দেগঙ্গায় হয়েছে একতরফা মুসলমানদের আক্রমণ। দেগঙ্গায় হিন্দুসমাজের মন্দির, মুর্তি, দোকানঘর, বাসগৃহের ওপর মুসলমান জনতার এসব আক্রমণের খবর কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ইংরাজি সংবাদপত্রে (যাদের দুএকটির কলকাতা সংস্করণ রয়েছে)। এমনকি দেগঙ্গার খবর এখন বিশ্বজুড়ে প্রচারিত কারণ ইন্টারনেটের অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ওয়াইকিপিডিয়াতেও দেগঙ্গার দাঙ্গা নিয়ে আলাদা খবর রয়েছে।[২৮] এরপর ঘটল আরো বড় ঘটনা, দেগঙ্গা অঞ্চলের ১৮টি দুর্গাপূজা কমিটি এবার পূজা করল না। পূজা হুজুকের পশ্চিমবঙ্গে কোথাও পূজা হচ্ছে না (বাংলাদেশে যা আকছার হয়) এতবড় একটা খবর কোন বাংলা কাগজ তা ছাপাল না, ছাপাল একমাত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।[২৯] (অন্য একটি খবর অনুযায়ী সংখ্যাটি ৩১)। ১৪ অক্টোবর খোদ কলকাতায় মেট্রো চ্যানেলে দেগঙ্গার পূজা কমিটিরা কয়েক ঘন্টা অবস্থান করলেন, তাও কোন কাগজে এল না। অর্থাৎ, এখন পশ্চিমবাংলার খবরের জন্য নির্ভর করতে হবে পশ্চিমবাংলার বাইরের মিডিয়ার ওপর, একসময় যেমন সারা উপমহাদেশ নির্ভর করত 'বিবিসি'র ওপর। ইসলামি পশ্চিমবঙ্গ আর সীমান্ত এলাকার গপ্পো নয়, খোদ কলকাতায় ২১ নভেম্বর ২০০৭-এ তসলিমা বিতাড়নের পর আবার কলকাতার কাছেই দেগঙ্গা জানিয়ে দিল কারা সংখ্যালঘু ও সংখ্যালঘুরা কিভাবে থাকবেন। মনে রাখতে হবে ১৯৯১-র জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী দেগঙ্গা ব্লকে ৬৭.৫% মুসলমান, ২০১০-এ সংখ্যাটা যে আরো বেশি তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

নীরবতা আর স্বর্ণালী নয়, নীরবতা মানে আগামী দিনের বিভীষিকাকে মুখ বুজে আমন্ত্রণ জানানো।

৫

কি করবেন?

সুতরাং মুসলিম দুনিয়াকে অনুসরণ করে সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ হয়ে উঠছে আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গের চালিকা শক্তি। এখন পর্যন্ত সে শক্তির আদর্শগত উপাদান মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সংস্কার। স্রেফ সংখ্যাগত ও পেশী শক্তির জোরেই এই শক্তি এই পশ্চিমবঙ্গেরও দখল নিতে পারে অদূরভবিষ্যতে। এরপর পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষ বহুত্ববাদী ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করতে পাঠক ঠিক করুন কি করবেন

গিয়াসুদ্দিনদের পক্ষে প্রকাশ্য সমর্থনে যাবেন না তাঁর বিরোধীদের পক্ষেই থাকবেন?

শাহরিয়ার কবিরদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আদিবাসীদের কথা সবাইকে জানাবেন না নীরবতাই বজায় রাখবেন?

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের জন্য আন্দোলন করবেন না বুদ্ধ-মমতার সঙ্গে আরো মাদ্রাসার দাবীতে সোচ্চার হবেন?

শিরিন মিদ্যার পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের বোরখার অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবেন না আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্মীয় মৌলবাদের আখড়া হতে দেবেন?

তসলিমা নাসরিনকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনবার দাবী করবেন না পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-সাহিত্য সেন্সরের ভার ইমামদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যচর্চায় মন দেবেন?

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ বজায় রাখবার চাবিকাঠিটি এখনও আপনাদের কাছেই আছে, তা কি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন?

[১] B.R.Ambedkar *Pakistan or Partition of India*, p 116, Babashaeb Ambedkar Writings and Speeches Vol8, Education Department, Government of Maharashtra, 1990.

[২] ঐ পৃ: 118

[৩] http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Iran

[৪] http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt

[৫] http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia

[৬] http://www.indonesiamatters.com/326/religious-freedom-report/

[৭] http://en.wikipedia.org/wiki/Maldives

[৮] Abdul Barkat et al – *Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh- Living with Vested Property,* Pathak Samabesh, Dhaka, 2008.

[৯] Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council – Communal Discrimination in Bangladesh: Facts and Documents, pp 431-435, Dhaka 1993.

[১০] একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি - ১৫০০ দিনের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিবরণ - শ্বেত পত্র, সম্পাদনা - শাহরিয়র কবির, ৩ খন্ড, ঢাকা, ২০০৫

[১১] Abdul Barkat et al – *Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh- Living with Vested Property,* pp 66-68, Pathak Samabesh, Dhaka, 2008.

[১২] Mohammad Rafi, *Can We Get Along*, pp 201, Panjere Publications, Dhaka 2005

[১৩] Wikepedia থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের ওয়েবসাইটে এই তথ্যগুলি পাওয়া যাবে।

[১৪] পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা আজ দেশের গর্ব - তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট, ২০১০।

[১৫] গিয়াসুদ্দিন - মাদ্রাসা শিক্ষার পশ্চাদগামিতা নয়, চাই মূলধারার আধুনিক উচ্চশিক্ষা - হিযাব ঃ নারী দাসত্বের প্রতীক, পৃ-১২৭, - মার্চ, ২০১০, কলকাতা।

[১৬] মাদ্রাসা দর্পণ, ষষ্ঠ বর্ষ, পাঠ্যসূচী সংখ্যা - পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, আগস্ট ২০০৭।

[১৭] (http://banglapedia.search.com.bd/HT/P_0101.htm)

[১৮] Hiranmoy Karlekar, *Bangladesh – The Next Afghanisthan*, pp 38, Sage Publications 2005

[১৯] অনুপ্রবেশ , অস্বীকৃত উদ্বাস্তু ও পশ্চিমবঙ্গের অনিশ্চিত অস্তিত্ব - মোহিত রায়, অনুষ্টুপ, শারদীয় ২০০৯

[২০] মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ - জগদীশ মন্ডল, ১ম খন্ড, পৃ ২২১ (উদ্ধৃত -ভারত বিভাজন যোগেন্দ্রনাথ ও আম্বেদকর - শ্রীবিপদভঞ্জন বিশ্বাস, পৃ ১৫, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৩)

[২১] ভারত বিভাজন যোগেন্দ্রনাথ ও আম্বেদকর - শ্রীবিপদভঞ্জন বিশ্বাস, পৃ ১২৭-৩২, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৩ । যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের মূল ইংরাজীতে পদত্যাগপত্র ও তার বঙ্গানুবাদ পাওয়া যাবে শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের লেখা 'মুসলিম রাজনীতি ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের পদত্যাগ' বইতে। প্রাপ্তিস্থান - বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

[২২] মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ - সদানন্দ বিশ্বাস , পৃঃ ১৬০-১৬১, দীপালি বুক হাউস, কলকাতা ২০০৪

[২৩] The Telegraph - Sunday , August 3 , 2008

[২৪] আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১০

[২৫] আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১০

[২৬] Times of India, Kolkata, 9 September, 2010

[২৭] আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ অক্টোবর ২০১০

[২৮] http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Deganga_riots

[২৯] Indian Express, 10 October, 2010

(দেশকাল ভাবনা - ৫ নভেম্বর, ২০১০)

যুক্ত বাংলা ধর্মীয় ভিত্তিতে ভেঙে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান, এখন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুরা ২২ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানরা ১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০ শতাংশ এবং তা দিনে দিনে বৃদ্ধির দিকে। বাংলাদেশী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসকে ইতিমধ্যেই পাল্টে দিয়েছে। এর সাথে বর্তমানে শুরু হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার রমরমা, ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাতা, আলিগড় ও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ইমামদের রাজনৈতিক মঞ্চে অধিষ্ঠান, তসলিমা বিতাড়ন, ইসলামি দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ, মুসলিম সংরক্ষণ ইত্যাদি। পাশেই বাংলাদেশে মোল্লাতন্ত্রের হুঙ্কার। ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াণযাত্রার কিছু কথা রইলো এই বইয়ে।

মোহিত রায় ছাত্র আন্দোলনে এবং আশির দশক থেকে দিল্লি ও কলকাতার মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধদের মানবাধিকারের দাবীতে প্রচার আন্দোলন ও বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত আসা উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

ক্যাম্প
২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
মূল্য ঃ ১০০ টাকা

ISBN : 81-86883-79-7